Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

জুলাই ২০২১ ■ আষাঢ়- শ্রাবণ ১৪২৮

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

বাহারি ফলের দেশ

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

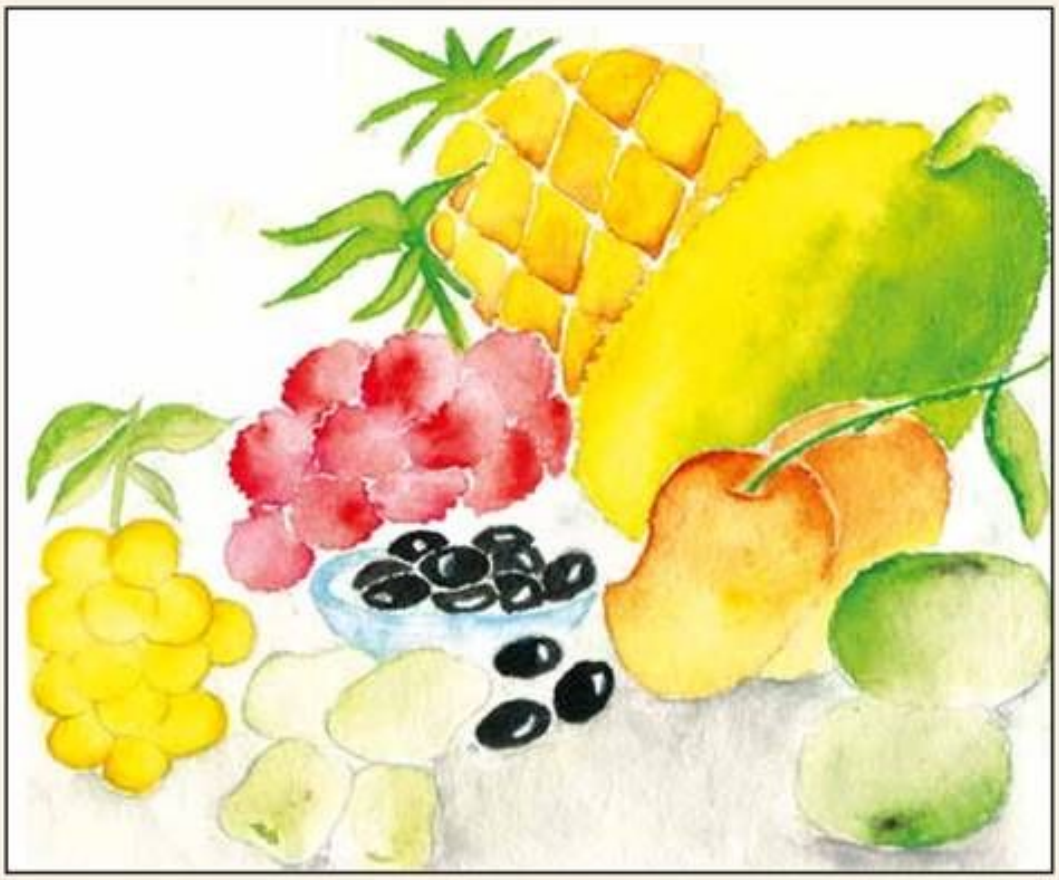

মাইশা বিনতে মাহমুদ, শ্রেণি সপ্তম, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

জান্নাত আরা জিনান, দ্বিতীয় শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

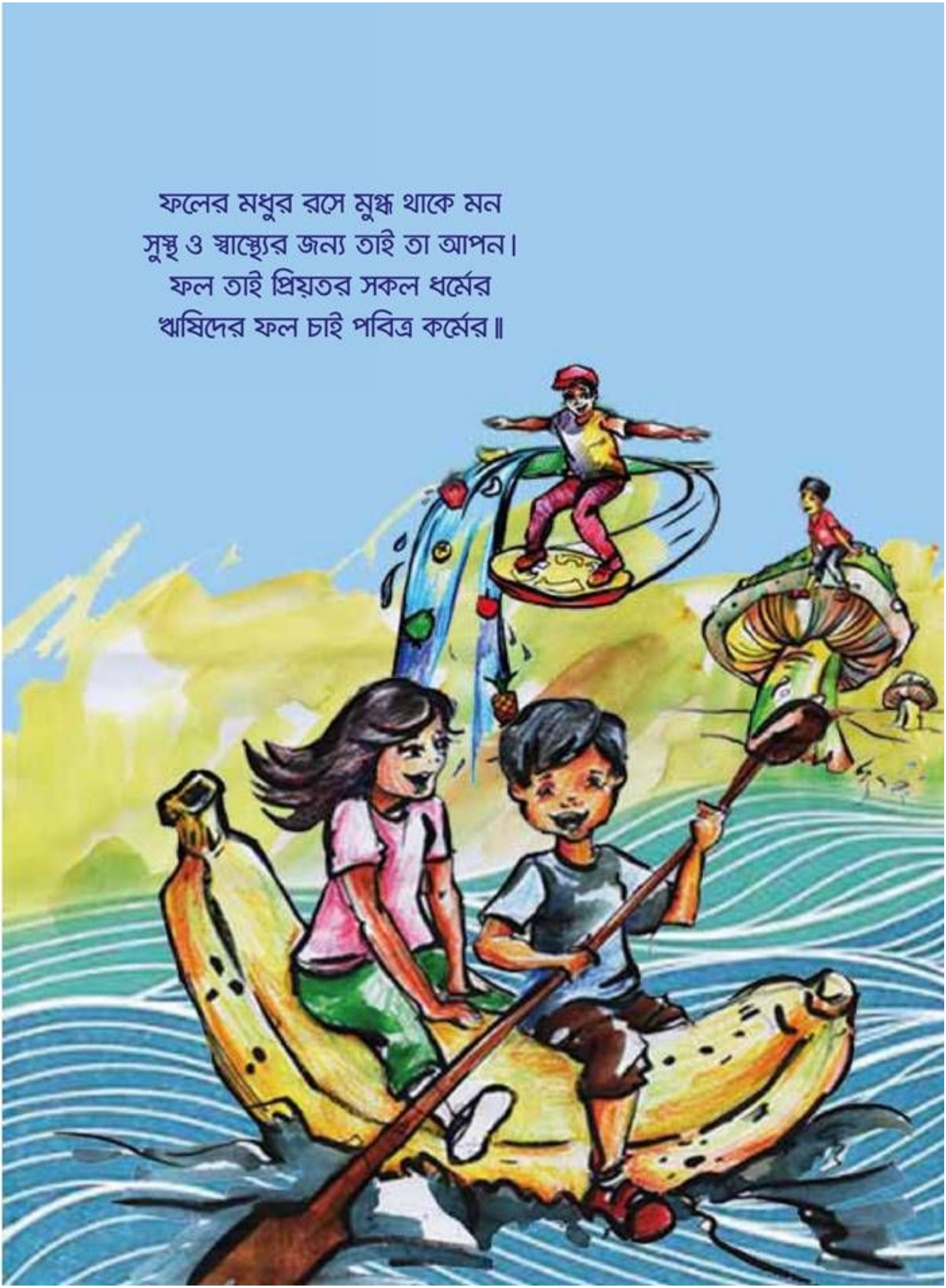

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সম্পাদকীয়

প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। করোনাকালীন এই সময়ে তোমাদের হাতে এখন অখণ্ড অবসর। তার মধ্যে আবার বর্ষাকাল। বর্ষার প্রথম মাস আষাঢ়। বাঙালির জীবনে আষাঢ় মানেই বৃষ্টিমুখর দিন। আর বর্ষাকালের আসল মজাই যেন ছোটোদের জন্য। কবিগুরু বলেছেন, 'বর্ষাকাল ঘরে থাকবার কাল, কল্পনা করবার কাল, গল্প শোনাবার কাল, ভাইবোনে মিলে খেলা করবার কাল।' সত্যিই... তাই না বন্ধুরা?

নবারুণের এ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে দেশি ফল দিয়ে। এ সময় আমাদের দেশে প্রচুর রসালো ফল পাওয়া যায়। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, আনারস–এসব ফলের রসে টইটম্বুর হয়ে যায় সারাদেশ। আমাদের মন উতলা হয়ে ওঠে। বাহারি ফলের রাজা হলো আম আর জাতীয় ফল কাঁঠাল। বন্ধুরা, তোমরা হয়ত জেনে থাকবে, আম হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ফল। স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয়। আর আমগাছ হচ্ছে আমাদের জাতীয় বৃক্ষ।

আমাদের দেশে সারাবছর হরেক রকমের ফল পাওয়া যায়। ফলে আছে অনেক পুষ্টিগুণ। বেশি বেশি ফল খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশি ফল খেতে পছন্দ করেন এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে ফল উপহারও দেন। বন্ধুরা, এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই সম্মানের।

তোমাদের জন্য শুভকামনা। ভালো থেকো, নিরাপদে থেকো বন্ধুরা। নবারুণের সাথে থেকো।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

০৪ বাহারি ফলের দেশ/শাইখ সিরাজ
০৮ আমের নাম বৈশিষ্ট্য/ড. মোহাম্মদ হাননান
১২ বাংলাদেশের ফল জিভে আনে জল/শামস্ নূর
১৭ ফলে অনন্য বাংলাদেশ/মেজবাউল হক
৩২ লটকন/জাকির হোসেন
৩৪ বিস্কুটের বিনিময়ে ফল/ফাহমিদা জাহান মহুয়া
৩৭ বারোমাসি ফল/দ্বীন ইসলাম
৩৮ রইলো বাকি পাঁচ/শাহীন আলম
৩৯ বিলুপ্ত প্রায় কিছু ফল/আব্দুল বাশার
৪১ ফল খাবার সময়-অসময়/মো. জামাল উদ্দিন
৫৬ নতুন ফল- নতুন আশা/আরিফুর রহমান
৫৯ শিশুর দুরন্তপনা সামলাতে করণীয়/সুলতানা বেগম
৬২ শিশুদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়/মাহবুবা আক্তার
৬৩ কন্যা শিশু/জান্নাতে রোজী

গল্প

১৯ ফল শরীরের বল/উৎপলকান্তি বড়ুয়া

ভাষা দাদু

৪৬ ভাষা দাদুর সঙ্গে/তারিক মনজুর

ষড়ঋতুর ফল

২৬ গ্রীষ্মকালীন ফল/তানিয়া ইয়াসমিন
২৮ বর্ষার ফল বন্দনা/শাহানা আফরোজ
৩১ রোদ-বৃষ্টির খেলায় শরতের ফল/তৈয়বুর রহমান
৩৩ হেমন্তের ফল কথন/শাহনাজ সুলতানা
৩৫ রঙিন ফলে সমৃদ্ধ শীতকাল/সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৩৬ বসন্তের সুস্বাদু ফল/আল ওয়াসিয়া শাহীদ

বড়োদের কবিতা

২৩ সুস্বাদু ফল/অমিত কুমার কুণ্ডু
৪৪ মধুমাসের ফল/কবির কাঞ্চন
৪৪ মধুমাসে মধুর হাড়ি/খান মাহবুবুর রহমান বাদল
৪৫ ফল/বেণীমাধব সরকার
৪৫ ফল/আহনাফ হোসেন
৪৫ আম ছড়া/আসমা আক্তার
৪৮ বর্ষা এলে/ফারুক হাসান
৪৯ যেই দেশেখোরশেদ আলম নয়ন
৪৯ ইচ্ছেগুলো/সাঈদ তপু
৪৯ আমাদের গ্রাম/রকিবুল হাসান (রিজন)

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

২৫ মহান নেতা/মো. মশিউর রহমান
২৫ খোকা/জাওয়াদুল আলম

ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

৫০ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ

ছোটোদের ছড়া ও গল্প

১৪ আম/আরিফা আক্তার
৩০ ফলের ছড়া/তাহমিনা জিনাত
৪৮ বর্ষা/জাওয়াদুল ইসলাম ভুঁইয়া
৬১ বর্ষায় একদিন/মুহাম্মদ বিহাম

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: জান্নাত আরা জিনান/মাইশা বিনতে মাহমুদ

১৮ মেহেদী হাসান মিহাদ
২১ ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন
২৬ সৈয়দ ফারহান জিম
৬০ পরিধি ত্রিপুরা
৬৪ রিজওয়ান আল রাহাত
৬৪ আরিকা আজিজ ফারিন

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বাহারি ফলের দেশ

শাইখ সিরাজ

প্রবাদ আছে 'বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়'। আমাদের দেশে ফলে শুধু বৃক্ষের পরিচয়ই মেলে না, কৃষকের পরিচয়ও মেলে। পেঁপে বাদশা, পেয়ারা আতিক, কুল সিরাজুল, আম কাশেম, মাল্টা বাবুল, খেজুর মোতালেব, লিচু কিতাব, কলা কাদের। নামগুলো মোটেও কাল্পনিক নয়। দেশের প্রায় সব ফল চাষি এ নামগুলোর সঙ্গে পরিচিত। আশির দশকে পাবনার ঈশ্বরদীর সলিমপুর গ্রামের এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান মো. শাহজাহান আলী বাদশা বেকারত্ব দূরীকরণের উপায় হিসেবে বেছে নেন কৃষিকাজ। মাত্র আড়াই বিঘা জমিতে শুরু করেন আধুনিক ফল-ফসলের এক সমন্বিত কৃষি খামার। তারপর পেঁপে চাষ করে খুব অল্প সময়ে অর্থ আর খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। এখন ২০০ বিঘা আয়তনের এক বিশাল কৃষি খামারের অধিকর্তা তিনি। সবার কাছে পেঁপে বাদশা নামেই পরিচিত। কৃষি ডিপ্লোমা করেও কোনো চাকরি না পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় আতিক প্রায় ১০ বছর আগে মাত্র ৬ বিঘা জমি লিজ নিয়ে শুরু করেছিলেন পেয়ারা বাগান। পেয়ারা চাষ তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে। এখন তার বাগানের পরিধি ২৭০ বিঘার মতো। তার এ সাফল্য দেখে ওই এলাকার বহু তরুণ যুক্ত হয়েছেন পেয়ারা চাষে। ফলে নাটোর-রাজশাহী এলাকা অর্থকরী ফসলের অন্যতম জায়গায় পৌঁছে গেছে থাই পেয়ারা। এ রকম গল্পই কাশেম, বাবুল কিংবা কাদেরের। ফল চাষ পালটে দিয়েছে তাদের জীবনের গল্প। সারাদেশে এমন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

এ ই স ব কৃষকের সাফল্যের পেছনে নেই কোনো অলৌকিক আলাদিনের চেরাগ। বুদ্ধি আর শ্রমেই গড়েছেন তাদের নিজ নিজ সাম্রাজ্য। পেয়েছেন কাঙ্ক্ষিত ফল, সাফল্য। এদের হাত ধরেই বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ ফল উৎপাদনে সফলতার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) হিসাবে, বাংলাদেশে ১৮ বছর ধরে ফল উৎপাদন বাড়ছে ১১.৫ শতাংশ হারে। ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হারের রেকর্ডটিও আমাদের। শুধু তাই নয়, মৌসুমি ফল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ। এ সাফল্যে ফল চাষিদের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বিশেষ করে 'বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প'-এর কার্যক্রম আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। কারণ এ প্রকল্পের পরিচালক মেহেদী মাসুদ আমাদের 'ছাদ কৃষি' অনুষ্ঠানের গাছের ডাক্তার। তার কাছ থেকে সব সময়ই এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমের মৌসুমে প্রচুর আম খাওয়া হলো। শুধু যে নিজে খেয়েছি, তা না। স্বজনদেরও চেষ্টা করেছি আম উপহার দিতে। কৃষি সাংবাদিকতার চার দশকে দেশ-বিদেশের শত শত কৃষি উদ্যোক্তাদের সাফল্য তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে আমার। সে সব প্রতিবেদন দেখে নতুন নতুন কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমার নিজের কৃষি উদ্যোগ বলতে তেমন কিছু নেই। শাহানার (আমার স্ত্রী) বাড়ির ছাদে একটা ছাদ কৃষির আয়োজন আছে, যেখান থেকে এই করোনার সময়ে তাজা শাকসবজি পেয়েছি। ছাদে দুয়েকটা আমের গাছ আছে, সেখানে আম ফলেছে। আর আমি এক টুকরো আমের বাগান গড়েছি। সেখান থেকে নিজ গাছের আম পেয়েছি। এ বছর বিভিন্ন জেলা থেকে কৃষক তার বাগানের আম ভালোবাসার উপহারস্বরূপ আমাকে পাঠিয়েছেন। সেই আম আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে পরম তৃপ্তি পেয়েছি।

আমাদের দেশে আম উৎপাদন দিন দিন বাড়ছে। আম উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে আমরা শীর্ষ ১০-এ এসে গেছি। সব ফলের মাঝে দেশে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হচ্ছে আমের। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে আম উৎপাদিত হয়েছে ১২ লাখ ২২ হাজার টন। প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার একর জমিতে আমবাগান রয়েছে। সেই হিসাবে প্রতিটি গাছে গড়ে ৭৭ কেজি করে আম উৎপাদিত হয়।

মনে আছে, এক যুগ আগেও আম ছিল শুধু বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ফল। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে হিমসাগর, গোপালভোগ, ল্যাংড়া ও ফজলি আমের ওপর দেশের চাষিরা নির্ভরশীল ছিলেন। আম্রপালি আম চাষের ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ভেঙে দিয়েছে। বর্তমানে ৩০টি জেলায় আমের বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে। দেশের মোট উৎপাদিত আমের প্রায় অর্ধেকই আম্রপালি। আম এখন আর মৌসুমি ফল নয়। চাষ হচ্ছে বারোমাসি আমের। কাটিমন ছাড়াও বারি-১১ জাতের আম বারোমাস ফল দিচ্ছে। ফেনীর সোনাগাজীর মেজর সোলায়মান। যিনি মাছের খামারের ৩৩ একর জলায়তনের চওড়া পাড় জুড়ে ৮০ জাতের আম উৎপাদন করছেন। যেখান থেকে বছরে প্রায় ২০-২৫ টন আম পান তিনি। সোলায়মান সাহেবের বারি-১১ জাতের আম গাছ আছে ৭০টি। মাত্র পাঁচ বছর বয়স এসব গাছের। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি গাছ থেকে কমপক্ষে ১০০ কেজি আম পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের কৃষক যে অনন্য এবং প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দেখাতে সক্ষম তার প্রমাণ দিয়েছেন অনেক কৃষক। দুই যুগ আগেও আম আর কাঁঠাল ছিল এ দেশের প্রধান ফল। কৃষকের আঙিনার গাছে ফলানো উদ্বৃত্ত ফল বাজারে মিলত। আঙিনা থেকে ফল চলে এসেছে ফসলের মাঠে। কৃষি অধিদফতরের হিসাবে, এখন বাংলাদেশে ৭২ প্রজাতির ফলের চাষ হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রায়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

১.৫৭ লাখ হেক্টর জমিতে ৫০.৭ লাখ মেট্রিক টন ফল উৎপাদিত হয়, যার মধ্যে আম, কলা ও কাঁঠাল এ তিনটি প্রধান ফল থেকে আসে মোট উৎপাদিত ফলের প্রায় ৬৩% (বিবিএস-২০১৮)। নিত্যনতুন ফল চাষ বাড়িয়েছেন কৃষকরা। ড্রাগন তো আছেই, রামবুটান, অ্যাভোকাডো, স্ট্রবেরি, বাউ কুল, আপেল কুল, ত্বীন এমনকি আপেল পর্যন্ত ফলিয়ে ছাড়ছেন দেশের মাটিতে। নানান জাতের ফলের উৎপাদনের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

শহরের বাড়ির ছাদগুলোয়ও হরেক রকম ফলের চাষ হচ্ছে। আশির দশকে বাড়ির ছাদে কাজি পেয়ারার চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এখন ছাদ কৃষি উদ্যোক্তারা শুধু পেয়ারাই নয়, আখ থেকে শুরু করে জামরুল, ড্রাগন, পেঁপে, জলপাই, তেঁতুল এবং বিদেশি ফলের মধ্যে ত্বীন, এমনকি কলাও চাষ করছেন। ফল চাষের এ বিস্তারে দেশের নার্সারিগুলোর ভূমিকাও অপরিসীম। কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্যানুযায়ী, দেশে নিবন্ধনকৃত নার্সারির সংখ্যা ১৮ হাজার। অনিবন্ধিত নার্সারির সংখ্যা আরও বেশি। বিনিয়োগের পরিমাণ ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। ৫ লাখের অধিক মানুষ এ খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এক সময় বাংলাদেশ ছিল আম, জাম ও কাঁঠালের দেশ। এখন আমাদের দেশ হয়ে উঠেছে বাহারি ফলের দেশ। কমলা, ড্রাগন, বাউ কুল, আপেল কুল, স্ট্রবেরি, পেয়ারা, লটকন, পার্সিমন, তরমুজ, বাঙ্গি, অ্যাভোকাডো, সৌদি খেজুর ইত্যাদি অসংখ্য ফল নানা বর্ণের, নানা গন্ধের ফলাচ্ছেন আমাদের কৃষক।

লেখাটি শুরু করেছিলাম আম নিয়ে। শেষ করার বেলায়ও আম দিয়েই শেষ করতে চাই। গত বছরের ঘটনা। সুমিষ্ট আমের দেশ হিসেবে ফিলিপাইনের খুব সুনাম রয়েছে। গত বছর ফিলিপাইনে আমের ফলন খুব ভালো হয়েছিল। এত ভালো হয়েছে যে, ২ মিলিয়ন কেজি আম বেশি উৎপাদিত হয়েছে। ফলে আমের দাম পাচ্ছিল না কৃষক। বাজার অর্থনীতিতে এমনটা ঘটতেই পারে। সে দেশের কৃষি বিভাগ আম চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারা খুব দ্রুত সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। তাদের কার্যক্রমগুলোর একটি হচ্ছে, 'মেট্রো ম্যাংগো'। তারা বিভিন্ন শহরে আম বিক্রির জন্য অসংখ্য স্টল তৈরি করেছে। আম রপ্তানির ব্যবস্থা করেছে। ওয়ালমার্ট কৃষকের আমের জন্য বিনামূল্যে স্টল বরাদ্দ দিয়েছে। সবাই মিলে

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গণভবনের গেটে ঢুকতেই একটি গাছে হয়েছে 'জাবটিকাবা'। গোড়া থেকে শুরু করে গাছটির প্রতিটি ডাল জুড়ে গাছের সঙ্গে লেগে থাকা সবুজ ও কালো রঙের এই ফল সবার নজর কাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে গাছটি থেকে সংগ্রহ করে খান এই ফল। খামারবাড়ির হর্টিকালচার সেন্টারের একটি গাছেও এবার এসেছে প্রচুর জাবটিকাবা। শুধু ঢাকা নয় খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, জামালগঞ্জ, নকলা, শেরপুর, গৌরিপুর, গোপালগঞ্জ, মাগুরা, যশোর ও চাঁপাইনবাগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারের অনেক গাছেও এবার হয়েছে হালকা সুগন্ধযুক্ত টকমিষ্টি প্রকৃতির এই বিদেশি ফল। ব্রাজিল এর আদি নিবাস। মাঝারি ঝোপালো প্রকৃতির ধীর বৃদ্ধির পূর্ণবয়স্ক গাছ ১০ থেকে ২০ মিটার উঁচু হয়। প্রচুর ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন সমৃদ্ধ এই ফলে ঔষধিগুণও রয়েছে। মার্চ-এপ্রিলে পাহাড় এবং এপ্রিল-মে মাসে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে এই ফল পাকে। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে ফুল আসে।

দাঁড়িয়েছে কৃষকের পাশে। কারণ কৃষক একবার হেরে গেলে সমগ্র কৃষির ওপরই এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

আমাদের দেশে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সরকারের পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর এগিয়ে আসতে হবে। যেমন পেয়ারা থেকে জ্যাম-জেলির শিল্পকারখানা হতে পারে। আনারস থেকে হতে পারে জুস। এছাড়া মাল্টা, তরমুজ, বাঙ্গিসহ নানা ফল থেকে তৈরি হতে পারে নানান জাতের খাদ্যদ্রব্য। ফল নিয়ে আমাদের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটা অনেক বড়ো। সারা বিশ্বেই ফলের বড়ো একটি বাজার আছে। তা মাথায় রেখে ফল চাষ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। তৈরি করতে হবে ফল সংরক্ষণাগার ও বাজার কাঠামো। সরকারের পাশাপাশি ফলকে নিয়ে বাণিজ্যের ক্ষেত্র তৈরি করতে এগিয়ে আসতে হবে শিল্পোদ্যোক্তাদের। ■

সাংবাদিক, কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আমের নাম বৈশিষ্ট্য

ড. মোহাম্মদ হাননান

আমের মৌসুম চলছে। এ মৌসুমে সবাই রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের দিকেই তাকিয়ে থাকে। এ বছর জেলা প্রশাসন আম চাষের উপর কড়া নজরদারি রেখেছিল। বাস্তি হওয়ার আগেই পয়সার লোভে আম পেড়ে ফেলার প্রবণতা এবার বোধ হয় রোধ করা গেছে। আমের ফলনও ভালো। বাজার আমে ছেয়ে গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন *আমের ১০০ জাত* শিরোনামে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছে। এমন উদ্যোগ এই প্রথম। ফলবান আমগাছ, আম ও আমের বিভিন্ন অংশের ছবি ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আছে এ অ্যালবামে। যদিও চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ সমগ্র দেশে ৩৫০ জাতের আম সুলভ ছিল। অনেকে মনে করেন, অনেক জাতের আম এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একসময় বাংলাদেশে দেড় হাজার জাতের আম পাওয়া যেত। [প্রথম আলো, ৮ই জুন ২০২১]

আমাদের শৈশব ও কৈশোরে দেখেছি আমাদের একটি বড়ো আমগাছ ছিল। এর আমের নাম ছিল 'গিলা'। এর অর্থ বের করা দুরূহ। অভিধানে 'গিলা' অর্থে বলা হয়েছে, 'চিবিয়ে যা খাওয়া হয়'। [বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, ঢাকা, ২০১৮ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪০২]।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তবে এ গাছটির তিনটি বড়ো শাখা ছিল, তিনটি শাখার আম তিন রকম স্বাদের ছিল। প্রতিটি শাখার আমই ছিল স্বাদে পরিপূর্ণ, মুখে দিলেই গলে যেত। বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মানুষকে আম খাওয়ানোর এক বড়ো কৃতিত্ব ছিল আমার পূর্ব পুরুষদের। তাঁর নাম ছিল বিটু। ব্রিটিশ আমলে এমন একটি সুন্দর নাম তাঁকে কে দিয়েছিল সেটা তাঁর বাবা-মা-ই ভালো করে জানেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ থেকে নৌকায় করে পূর্ববঙ্গে আম নিয়ে আসতেন। মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে কমলাঘাট বন্দরে ছিল তাঁর আমের আড়ত। এখান থেকেই সারা পূর্ববঙ্গে আম সরবরাহ হতো। আমের সঙ্গে তিনিও বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। বিক্রমপুরের টঙ্গিবাড়ি উপজেলার সোনারং গ্রামে তাঁর নির্মিত অট্টালিকা [১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এখনো ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান]

বাংলা পিডিয়ার মতে, বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং যখন (৬৩২-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) এ বাংলা-ভারত উপমহাদেশ সফরে এসেছিলেন, তখন তিনি এ সুস্বাদু ফল খেয়ে মোহিত হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, হিউয়েন সাং-ই বাংলার এ আমের খবর সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। [*বাংলাপিডিয়া*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-২২৬] ।

আমরা আমের ইংরেজি নাম Mango বলে জানি। আসলে 'ম্যাংগো' নামটি এসেছে তামিল ভাষা থেকে। তামিলরা আমকে 'ম্যানগো' বলে থাকে। এখান থেকে ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষায় 'ম্যাংগো' হয়। পর্তুগিজরা যখন উপমহাদেশে বসতি স্থাপন করে, তখন আমকে তারা Mango বলে। [*বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২২৬] ।

প্রাচীন আমল থেকেই বাংলা-ভারতে আমের উৎপাদন আছে। সংস্কৃত ভাষায় আমের অর্থ মজুদ খাদ্য বা রসদ। বোঝা যায়, কোনো একটা সময়ে এ অঞ্চলে আম ছিল মৌসুমের জন্য নির্ধারিত খাদ্য। এ মৌসুমে হয়ত মানুষ আম খেয়েই দিনানিপাত করত। তাই আমকে মজুদ খাদ্য বা রসদ বলা হয়েছে।

বাংলা একাডেমির অভিধানে আমের যে অর্থ করা হয়েছে তা রহস্যজনক। বলা হয়েছে, আম হচ্ছে, 'ক্রান্তীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ করা হয় এমন ভিটামিন এ, সি এবং ডি সমৃদ্ধ সবুজ-হলুদ-লাল প্রভৃতি বর্ণের সুস্বাদু ও রসালো ফল বা তার দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ বৃক্ষ'। জটিল ও হাস্যকরভাবে আমের এ অর্থের জন্য দেখুন, *[বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা, ২০১৮ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৬০ *]*

আম একটি আঁটিযুক্ত শাঁসালো ফল। ফলটি গোলাকার হয়, আবার ডিম আকৃতিরও হয়, কিছু আম আছে হৃৎপিণ্ডের মতো, বৃক্ক বা কিডনির মতো দেখতে আমও পাওয়া যায়। কিছু আম আছে গোলাকার আকৃতির মধ্যেও নিচ দিকে সামান্য গোলাকৃতির বাঁকানো।

আমের রং সাধারণভাবে কাঁচা থাকতে সবুজ হয়ে থাকে। তবে কাঁচা আমে সবুজের মধ্যেও কিছু আম সিঁদুর রং মেশানো থাকে, যা আমকে অলঙ্কৃত করে তোলে। পাকা আম হলুদ হবে এটা স্বাভাবিক, তবে কমলা ও মিশ্র রঙের লাল আভার আমও হয়ে থাকে। আম সাধারণভাবে ৩০০ গ্রাম থেকে ১০০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফজলি আম আকৃতিতে বড়ো এবং অনেক সময় দেড় কেজি ওজনের ফজলিও পাওয়া যায়।

আমের নামগুলো কীভাবে করা হয়েছে তা এখন আর অনুমান করা যায় না। কিছু আমের নামই নেই, যেমন চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক প্রকার আম পাওয়া যায়, যাকে গুটি আম বলে। এর স্বাদও অন্য জনপ্রিয়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আমের চেয়ে কম নয়। কিন্তু 'গুটি আম' বললে ক্রেতা অনাগ্রহী হয়ে পড়ে ফলে এ আমগুলো অন্য প্রসিদ্ধ আমের নাম ধারণ করে বাজারে আসে।

আমের নাম অনেকটা শাড়ির মতো, দোকানি যা বলে সেটা শাড়ির নাম হয়ে যায়। একজন দোকানে এসে 'বনলতা' শাড়ি খুঁজতে শুরু করল। দোকানি বলল, 'এই যে বনলতা শাড়ি'। অথচ একটু আগেই এ শাড়িটা সে বিক্রি করেছে 'জামলতা' শাড়ি বলে। আমও অনেকটা তেমনই, মানুষ আম খুব কম চেনে, কারণ সব আমই দেখতে প্রায় একই রকম। একজন এসে 'ল্যাংড়া' আম কিনতে চাইলে দোকানি তাকে যে আমটি ব্যাগে উঠিয়ে দিল, একটু পরে সে আরেকজনের কাছে 'ক্ষিরসাপতি' বলে চালিয়ে দেবে। তবে একই আমের নাম অঞ্চলভেদে তারতম্য হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ আম হলো 'ফজলি' যাকে আমের রাজাও বলা হয়ে থাকে। তবে ল্যাংড়া, হিমসাগর, ক্ষিরসাপতি, কোহিডুব, মোহনভোগ, হাড়িভাঙা ইত্যাদি নামের আমগুলোও জনপ্রিয়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

কদরের দিক থেকে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমই শ্রেষ্ঠ। এখানে উৎপাদিত হয় বিখ্যাত হিমসাগর, ল্যাংড়া ও ফজলি আম। ফজলি আমের নাম নওগাঁতে নাকফজলি। ফজলির আরো প্রকারভেদ আছে- চিনি ফজলি, সুরমা ফজলি ইত্যাদি। দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের বিখ্যাত আম আম্রপালি, সূর্যপুরী। রংপুর বিখ্যাত হয়ে আছে হাড়িভাঙা আমের জন্য। সাতক্ষীরার জনপ্রিয় আম হলো গোবিন্দভোগ। তবে রাজশাহীর হিমসাগর, সাতক্ষীরায় ক্ষিরসাপতি নামে পরিচিত, জাত একই, অঞ্চলভেদে দু'নাম।

আম্রপালি নামে যে আম বাজারে পাওয়া যায়, তা মূলত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কৃত আম– 'বারি : আম-৩' । পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আম্রপালি আমের চাষ হয়। পাহাড়ের আরেকটি বিখ্যাত আম 'রাঙ্গোয়াই'। আমের বুককে যেন সেলাই করে দিয়েছে এজন্য এর নাম স্থানীয় ভাষায় দেওয়া হয়েছে 'রাঙ্গোয়াই'।

নওগাঁর বিখ্যাত আম ছিল ঝিনুক আম । তবে এখন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 'বারি আম-৪' জাতের আম নিয়েও নওগাঁর কৃষকরা ব্যস্ত আছে। নানা জাতের আম নিয়ে ব্যস্ত খুলনা, নাটোর, টাঙ্গাইল, যশোর, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের আম চাষিরাও।

এখন যে শুধু চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন মাসেই আম পাওয়া যায় এমন নয়, আম পাওয়া যায় ১২ মাসই। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'বারি আম: ১১ এবং 'কাটিমন' (থাইল্যান্ডের জাত) সারা বছরই পাওয়া যায়। এ জাতের আম বছরে একই গাছে তিনবার ধরে। একটি জাতের আমই আছে যার নাম 'বারোমাসি'। বিদেশি আরো জাতের আম বাংলাদেশে এখন সুলভ। যেমন–রঙিন আমেরিকান পালমার, থাই ব্যানানা আম, মালয়েশিয়া লুবনা, তোতাপুরী, কিউজাই, পুনাই, আলফেনমো, মহাচানক, সূর্যডিম আম, আপেল আম, ব্রুনাই কিং, কিং অব চাকপাত আম, চিয়াংসাই আম, কেইন্ট আম ইত্যাদি। এর মধ্যে স্বেচ্ছাচারীভাবে অনেক নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন 'ব্রুনাই কিং' নামে কোনো আম আপনি ব্রুনাইতে গিয়ে পাবেন না।

আমের নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে এ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল সকল যুগেই। একটি সুমিষ্ট আমের নাম কেন হবে 'ল্যাংড়া' এ প্রশ্ন কেউ তোলেন না। 'মহাচানক' কী অর্থ প্রকাশ করে। 'গৌরমতি' নাম দেওয়া হয়েছিল কার মতিভ্রমে! গোপালভোগ, কালীভোগ, গোবিন্দভোগ, লক্ষ্মণভোগ এসব ভোগ কাদের জন্যে! 'রানিপসন্দ' আম কোন রানির পসন্দ থেকে এসেছিল, এসব উত্তর কিন্তু কেউ জানে না। একটি আমের নাম 'ভোগলা', কিন্তু আমের ভেতর তো কোনো গর্ত নেই, থাকার কথাও না, তবু নাম দেওয়া হয়েছে 'ভোগলা'। হাড়িভেঙ্গে দই খাওয়া যায়, কিন্তু আম 'হাড়িভেঙ্গে' খায় কীভাবে যে নাম দেওয়া হয়েছে 'হাড়িভাঙ্গা'। এসব নামে আমের কোনো বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র প্রকাশ করে না, কারো কারো খামখেয়ালিপনা এবং যা ইচ্ছে তা করার মনমানসিকতা থেকে এমন নামকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদও যে 'বারি: ৪' , 'বারি: ১১' ইত্যাদি আমের নাম দেয়, তা জনগণের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য, এমন নাম তো কখনোই মানুষের মুখে মুখে ফিরবে না। কেউ কি কোনো আম খেয়ে বলবে আজ 'বারি: ৪' খেলাম, কাল 'বারি: ১১' খাব। বরং মানুষ বলে আজ হিমসাগর খেয়েছি, কাল রাঙ্গোয়াই খাব। নামগুলো প্রতিষ্ঠানের নামে না বলে আমটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এমন আম চাই। আর যে আমগুলোর নামের মধ্যে অর্থ প্রকাশ করে না, সেসব আমের নাম পরিবর্তন করা জরুরি। ■

গবেষক ও প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বাংলাদেশের ফল জিভে আনে জল

শামস্ নূর

গাছ বা লতায় উৎপন্ন রসালো ফসলই হলো ফল। আমাদের দেশের অতি পরিচিত ফলগুলো হলো–আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, পেয়ারা, কুল প্রভৃতি। এই সব ফল সুস্বাদু আর আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফল থেকে আমরা পাই শর্করা, খনিজ লবণ আর ভিটামিন। ফলের শাঁস, জলীয় উপাদান আর বীজ আমাদের হজমে সহয়তা করে।

প্রাচীনকালে মানুষ বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। গাছের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত। আর সে কারণে ফল প্রাচীন যুগ থেকে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত। সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু, এই আধুনিক যুগে এসেও মানুষের ফল খাওয়ার ধরন কিন্তু একই রয়ে গেছে। শুধু মানুষ নয় ফল বহু প্রাণীরও খাদ্য। ফলের বীজ থেকে গাছের জন্ম হয়। কোনো কোনো গাছের ফল পাকা অবস্থায় ফেটে বীজ ছড়ানোর কাজ করে যা থেকে নতুন গাছ জন্ম নেয়। আবার কখনো-বা পাখিরাও তা ছড়াতে সাহায্য করে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এখনও 'ফলই বল' এমনটাই বলা হয়। ফল হলো পুষ্টিতে ভরপুর এক খাদ্য। কোনো ফল কাঁচা আবার কোনোটি পাকা অবস্থায় খাওয়ার উপযোগী হয়। কোনো কোনোটি আবার কাঁচাপাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। মানুষের পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, ভেষজ ওষুধের জোগান, পশুপাখির খাবার, দৈনন্দিন জ্বালানি কাঠ ও আসবাবপত্রের চাহিদা মেটানো এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ফল ও ফল গাছের অবদান অনস্বীকার্য। ফল কী? আভিধানিকভাবে ফল হলো– গাছের শস্য বা বীজ। আসলে এক কথায় এর উত্তর পাওয়া যায় না। উদ্ভিদতাত্ত্বিক অর্থে– উদ্ভিদের নিষিক্ত (fertilized) ও পরিণত (developed) ডিম্বাধারকে ফল বলা হয়। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিষিক্ত ছাড়াই ফল উৎপন্ন হয়। আবার সব ফলই ফল নয়। ফলের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণভাবে যেসব উদ্ভিদের ফল পাকা অবস্থায় রান্না না করে খাওয়া হয় সেগুলোকে ফল বলে। কিন্তু এমন অনেক ফল রয়েছে যেগুলো পাকা অবস্থায় রান্না না করে খাওয়া যায় কিন্তু এগুলো ফল নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় টমেটোর কথা, এটি কিন্তু সবজি হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া, অনেক ফলই কাঁচা অবস্থায় অথবা নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়া যায় বা খাওয়া হয়। আসলে কোন কোন উদ্ভিদ ফল হিসেবে পরিগণিত হবে, তা বিভিন্ন দেশ বা এলাকার স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। একই উদ্ভিদ ফল হিসেবে পরিগণিত হবে তা বিভিন্ন দেশ বা এলাকার স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। একই উদ্ভিদ ফল ও সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন– পেঁপে।

মানুষের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ফল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। প্রধানত পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ফল খাওয়া হয়। স্বাদ ও পুষ্টি মূল্যের দিক দিয়ে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষভাবে সমাদৃত। বেশিরভাগ ফলই দেখতে আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু এবং সকল শ্রেণির মানুষের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। ফলে সব ধরনের পুষ্টির উপাদান কমবেশি রয়েছে, কিন্তু খাদ্যপ্রাণ (vitamins), খনিজ পদার্থ (minerals) এবং শর্করা (sugars) অধিক পরিমাণ থাকার কারণে এগুলো মানুষের পুষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

অনেক সবজি আছে যেগুলো ফলের মতো, এমনকি তারচেয়েও পুষ্টিকর কিন্তু সবজির স্বাদ কখনো ফলের সমতুল্য হয় না। তাছাড়া, সিদ্ধ করে খেতে হয় বলে সিদ্ধ করার সময় সবজির খাদ্যপ্রাণসমূহ অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, ফলে থাকা খাদ্যপ্রাণ সমূহের সবটুকু দেহ গ্রহণ করতে পারে। ফল বিশেষভাবে ক্যারোটিন (উদ্ভিদজাত খাদ্যে ভিটামিন-এ থাকে না, থাকে ক্যারোটিন যা খাওয়ার পর ভিটামিন-এ তে পরিণত হয়), ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ও লৌহ সমৃদ্ধ। এ কারণে নিয়মিত ও প্রচুর পরিমাণে ফল খেলে পুষ্টি সমস্যা দেখা দেয় না। উন্নত দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ফল খেয়ে থাকেন। আর সে কারণে আমাদের দেশের লোকজনের তুলনায় তাদের স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার এটি অন্যতম কারণ।

কাঁচা ফলের রং সবুজ কিন্তু ফল পাকলে হয় রঙিন। ফল পাকলে ফলের খোসা, ফলত্বক বা ফুলের ডিম্বাশয় পরিবর্তিত হতে থাকে। ফুলের ডিম্বাশয় বলতে ফুলের ভেতরে পেটমোটা ঘড়ার মতো যে অংশ থাকে তাকে বোঝায়। ফুল থেকে ফল হয়ে ওঠার সময় ফলের খোসাটি আস্তে আস্তে সবুজ হয়ে ওঠে এবং এক সময় কাঁচা ফল গাঢ় সবুজ রং ধারণ করে। ক্লোরোফিল থাকার কারণে এমনটা হয়ে থাকে।

ফল যখন পাকতে শুরু করে তখন ফলের খোসার ক্লোরোফিল অণুগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হতে শুরু করে। ক্লোরোফিল অণু নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের রং পালটাতে থাকে। কিন্তু ক্লোরোফিল না থাকার জন্য ফলের রং সত্যিকারের হালকা বা বর্ণহীন হয়ে পড়ে না। কারণ ফল পাকতে আরম্ভ করলে ফলের ত্বকে ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল রঙ্গক ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। এতে ফলের রং আস্তে আস্তে হলুদ ও কমলা বর্ণ ধারণ করতে শুরু করে। ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি থাকলে ফলের রং হলুদ হয়। যেমনটা আমরা দেখি পেয়ারার বেলায়। জ্যান্থোফিল রঙ্গকের পরিমাণ বেশি থাকলে ফলের রং কমলা বর্ণের হয়। যেমনটা আমরা দেখি কমলালেবুর ক্ষেত্রে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল রঙ্গক কাঁচা ফলের ভেতরে থাকে, তবে কম পরিমাণে। ফল পাকতে শুরু করলে এদের পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকে।

ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল ছাড়াও পাকা ফলে আরো এক ধরনের নতুন রঙ্গক থাকে যা কাঁচা ফলে থাকে না। ফল পাকতে শুরু করলেই লাইকোপিন রঙ্গক তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। লাইকোপিন থাকার জন্য ফলের রং লালচে হয়ে পড়ে। টমেটোতে লাইকোপিন বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল ও লাইকোপিন রঙ্গক থাকে বলেই পাকা ফল রঙিন হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন মৌসুমে নানা রকমের ফল পাওয়া যায়। সারা বছর উৎপাদিত ফলের প্রায় ৬০ শতাংশ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ (মে-আগস্ট) এ চার মাসেই পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকম দেশীয়ও ফল পাওয়া যায়। তবে আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আনারসই প্রধান। এছাড়া জাম, আমলকী, আতা, করমচা, জামরুল, বেল, গাব, কাঁচা তাল ইত্যাদি। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে উৎপাদন হয় ২১ শতাংশ, যার মধ্যে আমড়া, কামরাঙ্গা, কদবেল, চালতা অন্যতম। জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে উৎপাদন হয় মোট ফলের ১৯ শতাংশ, যার মধ্যে কুল, বেল, কলা, সফেদা অন্যতম।

বাংলাদেশ একটি আর্দ্র ও উষ্ণমণ্ডলীয় দেশ হওয়ায় এখানে প্রায় ১৩০ প্রজাতির ফল জন্মে। তার মধ্যে প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৭০টি ফলের চাষাবাদ হয়। ফল শরীরের ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস এবং ভেষজ বা ঔষধি গুণসমৃদ্ধ। ফল নিয়মিত খেলে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থ জীবন লাভ করা যায়। মোট উৎপাদিত ফলের প্রায় ৫৩ শতাংশ বাণিজ্যিক বাগান থেকে উৎপাদন হয়, বাকি ৪৭ শতাংশ ফলের জোগান আসে বসতবাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমি থেকে। কাজেই ফলসমৃদ্ধ দেশ গড়তে দুই জায়গাতেই ফল চাষে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি মানসম্মত ফল উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক বাগানের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তবে অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে পাহাড়ি এলাকা। বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড় ছড়িয়ে আছে চট্টগ্রামের কিছু অংশে, ময়মনসিংহের দক্ষিণাংশে, সিলেটের উত্তরাংশে, কুমিল্লার পূর্বাংশে, নোয়াখালীর উত্তর-পূর্বাংশে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই আছে দেশের মোট জমির প্রায় ১০ শতাংশ। এসব পাহাড়ের অনেকটা ভূমি বনাঞ্চল। ভূমি বৈচিত্র্যের জন্য মাঠ ফসলের চেয়ে উদ্যান ফসল চাষে পাহাড় বেশি উপযোগী। উদ্যান ফসলের মধ্যে বহু রকমের ফল পাহাড়ে চাষ করা যায়।

পাহাড়ে প্রায় ২০ রকমের ফল খুব ভালোভাবে চাষ করা যায়। বর্তমানে পাহাড়ে বেশ কয়েক রকমের ফলের বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে যেমন– আম, কলা, কাঁঠাল, লেবু ও আনারস। নতুন ফলের মধ্যে ড্রাগন ফল, মাল্টা ও কমলা চাষ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বান্দরবানের রামুতে চাষ করা হচ্ছে কাজুবাদাম। খাগড়াছড়িতে প্যাসন ফল চাষের সফলতাও দেখা গেছে। এরই মধ্যে সরকার এ অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও পুষ্টির চাহিদা উন্নয়নের জন্য পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আম

আরিফা আক্তার

আম খেতে মজা ভারি
লাগে অনেক স্বাদ,
ছোটো বড়ো সবাই খায়
যায় না কেউ বাদ।

নানান রকম নানান নামে
যায় যে আম পাওয়া
কাঁচা পাকা সব রকমে
যায় যে তাকে খাওয়া।

৭ম শ্রেণি, বারৈহাটা উচ্চ বিদ্যালয়
বাগেরহাট

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আয়তনে বিশ্বের অন্যতম ছোটো দেশ বাংলাদেশ ফল উৎপাদনে সফলতার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। ফল চাষে জমি বৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে। এ মুহূর্তে বিশ্বে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হারের রেকর্ড বাংলাদেশের। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাবে, বছরে ১০-১১ শতাংশ হারে ফল চাষের জমি বাড়ছে। একই সঙ্গে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ চারটি ফলের মোট উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। ২০ বছর আগে আম আর কাঁঠাল ছিল এই দেশের প্রধান ফল। কাঁঠাল উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়, আমে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম ও পেঁপেতে চতুর্দশতম স্থানে আছে বাংলাদেশ। আর মৌসুমি ফল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে দশম। আম, কাঁঠালের বাইরে মৌসুমি ফলের মধ্যে আছে জাম, লিচু, কুল, কামরাঙা, পেঁপে, বেল, লেবু, আনারস, আতা, সফেদা, লটকন, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি। একই সঙ্গে নিত্যনূতন ফল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ সফলতা পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭২ প্রজাতির ফলের চাষ হচ্ছে। আগে হতো ৫৬ প্রজাতির ফল চাষ।

আয়তনে বিশ্বে ৯৪তম; কিন্তু জনসংখ্যায় অষ্টম বাংলাদেশ। সবচেয়ে কম জমি, আর বেশি মানুষের এই দেশ ফল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় উঠে এসেছে। একই সঙ্গে নিত্যনূতন ফল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ সফলতা পেয়েছে। এত কম আয়তনের দেশ হয়েও ফল চাষে জমি বৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে। বছরে ১০ শতাংশ হারে ফল চাষের জমি বাড়ছে।

শুধু ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির দিক থেকে নয়, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণও গত এক যুগে দ্বিগুণ হয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের মানুষ দিনে ৫৫ গ্রাম করে ফল খেত। চলতি বছর তা ৮৫ গ্রামে উঠে এসেছে। এক সময় দেশে কাঁঠাল ও আম ছিল প্রধান ফল। এখন অন্তত ২২ প্রজাতির ফল বাংলাদেশের মানুষ নিয়মিত খায়। গত ১০ বছরে দেশে আমের উৎপাদন দ্বিগুণ, পেয়ারা দ্বিগুণের বেশি, পেঁপে আড়াই গুণ এবং লিচু উৎপাদন ৫০ শতাংশ বেড়েছে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে নতুন ফল ড্রাগন ও অ্যাভোকাডো এবং দেশি ফল বাতাবিলেবু, তরমুজ, খরমুজ, লটকন, আমড়া ও আমলকীর মতো পুষ্টিকর ফলের উৎপাদনও ব্যাপক হারে বাড়ছে। এসব ফলের প্রায় পুরোটাই দেশে বিক্রি হচ্ছে।

কৃষিবিদদের মতে, ফল চাষে বাংলাদেশে রীতিমতো একটি বিপ্লব ঘটে গেছে। গত ১০ বছরে দেশে বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষের পাশাপাশি বাড়ির আঙিনা ও সড়কের পাশে ফলের গাছ রোপণের প্রবণতা বেড়েছে। বাংলাদেশ যে খাদ্য নিরাপত্তায় বিশ্বের অন্যতম সফল দেশ হয়েছে এবং বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে তিন বছরে ছয় ধাপ এগিয়েছে; তার পেছনে ধান, সবজি ও মাছের পাশাপাশি ফলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, এক যুগ আগেও দেশে ৫৬ প্রজাতির ফলের চাষ হতো। বর্তমানে ৭২ প্রজাতির ফল চাষ হচ্ছে। আরও ১২ প্রজাতির ফল বাংলাদেশের চাষ উপযোগী করার জন্য গবেষণা চলছে। এর মধ্যে চার প্রজাতির ফল ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মাটিতে সফলভাবে চাষ হয়েছে।

নতুন করে চাষ শুরু হওয়া ফলের মধ্যে ড্রাগন ফলের ২৩টি আলাদা প্রজাতি, খেজুরের ১৬টি, নারকেলের ২টি প্রজাতি, কাঁঠালের ১টি, আমের ৩টি নতুন প্রজাতি চাষের প্রাথমিক সফলতা পাওয়া গেছে। আগামী দু-এক বছরের মধ্যে তা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে 'পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প'-এর সাম্প্রতিক তথ্য মতে, বাংলাদেশের সীমিত জমিতে আরও বেশি ফল উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের ফলের চারা উৎপাদনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ১১টি জাতের প্রায় ৩০ প্রজাতির

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফলের চারা উৎপাদনের জন্য গবেষণা চলছে। এগুলো অবমুক্ত করলে বাংলাদেশ খুব দ্রুত ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ ফল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত ফলের মান উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনার উপায় সৃষ্টি করেছে। দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানে এবং পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণে ফল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। যেহেতু আমাদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে সে কারণে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতে করে অল্প জমি থেকে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করার বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর ফলে পরিত্যক্ত জমি, পাহাড়ি জমি কিংবা ছাদ কৃষির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে বাংলাদেশের বর্তমান সমৃদ্ধির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। ■

প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফলে অনন্য বাংলাদেশ

মেজবাউল হক

ফল মানবদেহে ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস। রয়েছে ভেষজ বা ঔষধি গুণ। নিয়মিত ফল খেলে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। থাকা যায় সুস্থ ও সুন্দর। আর্দ্র ও উষ্ণমণ্ডলীয় দেশ বাংলাদেশ। বিশ্বে বাংলাদেশ ফল উৎপাদনে ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে। আমাদের চিরচেনা ফলগুলো দেশের চাহিদা মিটিয়ে এখন যাচ্ছে বিদেশেও। অর্জন করছে বৈদেশিক মুদ্রা। বন্ধুরা, দারুণ খবর তাই না! এসো জেনে নেই আরো কিছু মজার তথ্য।

বিশ্বে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হারের রেকর্ড বাংলাদেশের। মৌসুমি ফল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় নাম রয়েছে বাংলাদেশের। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে চার শতাধিক ফল জন্মে, এরমধ্যে বাংলাদেশে জন্মে প্রায় ১৩০ প্রজাতির ফল। প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৭২টি ফলের চাষ হয় আমাদের দেশে। আগে চাষ হতো ৫৬ প্রজাতির ফল। মোট উৎপাদিত ফলের প্রায় ৫৩ শতাংশ বাণিজ্যিক বাগান থেকে উৎপাদন হয়, বাকি ৪৭ শতাংশ আসে বসতবাড়ি ও জমি থেকে।

ফল চাষে জমি বৃদ্ধির দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানে বাংলাদেশের নাম। একই সঙ্গে নিত্যনূতন ফল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ সফলতা দেখিয়ে যাচ্ছে। বিদেশের অনেক নামিদামি ফলও এখন আমাদের দেশে চাষ হচ্ছে। সরকারও ফল চাষিদের নানামুখী সহায়তা দিচ্ছে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাবে, বাংলাদেশে বছরে ১০-১১ শতাংশ হারে ফল চাষের জমি বাড়ছে। একই সঙ্গে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ চারটি ফলের মোট উৎপাদনে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

কাঁঠাল উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয়, আমে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম ও পেঁপেতে চতুর্দশতম স্থানে আছে বাংলাদেশ। আর মৌসুমি ফল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে দশম। বাংলাদেশ শুধু ফল উৎপাদন বৃদ্ধির দিক থেকে নয়, মানুষের মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণও গত এক যুগে দ্বিগুণ হয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের মানুষ দিনে ৫৫ গ্রাম করে ফল খেত। এখন এটি বেড়ে ৮৫ গ্রামে উঠে এসেছে। এক সময় দেশে কাঁঠাল ও আম ছিল প্রধান ফল। এখন অন্তত ২২ প্রজাতির ফল বাংলাদেশের মানুষ নিয়মিত খায়।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০০৫-০৬ সালে ফল রপ্তানি হয়েছিল মাত্র ৬.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের, ২০০৮-০৯ সালে ফল রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রায় ১৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করে। সবচেয়ে বেশি আয় করেছে ২০১২-১৩ সালে, যা প্রায় ৭২ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

বাংলাদেশ থেকে ফল যায় ভারত, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, ওমান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, কানাডা, জার্মানি, জাপান ও ইউএসএ। তবে রফতানির প্রায় ৯০ শতাংশ যায় ভারতে। বিশেষ করে আনারস (হানিকুইন জাত), আম, পেঁপে, লটকন, লেবু, সাতকরা, কুল, জলপাই, আমড়া প্রভৃতি ফল বিদেশে বেশি রপ্তানি হচ্ছে।■

মেহেদী হাসান মিহাদ, দ্বিতীয় শ্রেণি, মান্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফল শরীরের বল

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

গত তিন দিন ধরেই একটানা মুষলধারে বৃষ্টি। ঝরছে তো ঝরছেই। থামবার নামটি নেই যেন! বাসার তিন তলার জানালার সাথেই লাগোয়া নারকেল গাছ। নারকেল গাছের খোপে কাকের বাসায় আজ কাক দুটো নেই। বৃষ্টি বেশি বলে কোথাও হয়ত চলে গেছে। কোথায় যেতে পারে। দীপু জানালার ভেজা গ্রিলে মুখ ঠেকিয়ে ভাবতে থাকে। মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া যাক। ঠিক এ সময় হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ঠক ঠক ঠক..., ঠক ঠক ঠক...।

ভেতরে রান্নাঘর থেকে দীপুর উদ্দেশ্যে মা বলেন, -কে এল দেখ তো দীপু।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দীপু দরজা খোলে।

-ওমা! কী মজা, ছোটো মামা এসেছে। মা, ছোটো মামা এসেছে, দেখো ছোটো মামা। ছোটো মামাকে দেখে দীপু সে কী খুশি! ট্যাব হাতে কার্টুনে মজেছিল এতক্ষণ সুমি। ছোটো মামা এসেছে শুনে সেও লাফিয়ে ওঠে। দীপুর মতো সেও বলে ওঠে, -ওমা! ছোটো মামা এসেছে। কী মজা! কী মজা!

-আচ্ছা ধর আগে। আমাকে সহযোগিতা কর তোরা। একটা একটা ধর তো দেখি! বলে মামা একটা একটা থলে বাড়িয়ে দেয় দীপুর হাতে, সুমির হাতে। রান্নাঘর থেকে শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ততক্ষণে মাও এসে হাত বাড়িয়ে দেন। চার-চারটে বড়ো থলে। মা জানতে চান-এত সব কী রে ছোটন? ছোটো মামার নাম ছোটন। ছোটো মামা মায়ের খুব আদরের ভাই। চার মামার মধ্যে ছোটন মামা সবার ছোটো।

-আহা। আগে খুলেই দেখো না, তাহলে দেখবে তো কী আছে এখানে। প্রায় আধভেজা চোখ-মুখ থেকে বৃষ্টিতে ভেজা জল হাতের আঙুল দিয়ে সরিয়ে নিতে নিতে মামা বলল।

মা তাড়াতাড়ি তোয়ালে বাড়িয়ে দেয় মামাকে।

-ধর, আগে মাথা-মুখ মুছে নে তো ভালো করে। মামা তোয়ালে দিয়ে মাথা-মুখ-হাত মুছে নেয়।

থলে খুলে দেখে তো মায়ের চোখজোড়া কপালে ওঠার জোগার!

-এত সব কেন! এতগুলো আনতে হয় নাকি! এতগুলো ফল-ফ্রুটস কে খাবে বলো তো!

-এত কই। মৌসুমি ফল। এগুলো তো খেতে হয়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তাছাড়া তোমাদের তো এখানে এসব কিনে খাওয়া ছাড়া সম্ভব না। আর সব সময় এখানে কিনে খাওয়াও হয়ে ওঠে না। এগুলো তো আমাদেরই গাছের ফল বেশির ভাগ। দু-একটা অবশ্য কিনে নিয়েছি। তাও কম দামে। আমাদের গ্রামে শহরের চেয়ে ফলের দাম অনেক কম আছে, এটা একটা সুবিধা তো বটে! গাড়ি থেকে নেমে, চকবাজার থেকে আম আর কাঁঠাল কিনে নিয়েছি। আমাদের গাছের কাঁঠাল অবশ্য আনতে পারতাম। কিন্তু বয়ে আনার অসুবিধার জন্য আনিনি। দেশের ফলগুলোর সাথে আম-কাঁঠাল না আনলে কী হয় দিদি, তুমিই বলো? এতগুলো কথা একসাথে বলে ছোটো মামা এবার থামল।

এরই মধ্যে মা থলে থেকে বড়ো সিলভারের বলে সব ফল বের করছেন একে একে।

সুমি চোখ বড়ো বড়ো করে বলে ওঠে-ওরে বাব্বা! এওসব ফল-ফলাদি!

মা বললেন—কিছুই তো বাদ রাখিসনি। সবই তো বুঝি নিয়ে এলি।

-মামা এত্তোগুলো ফল! আচ্ছা, বলো তো এখানে কোনটা কী ফল! সবগুলো তো ঠিক চিনছি না। আম, কাঁঠাল আর পেয়ারা ছাড়া। দীপু ছোটো মামাকে প্রশ্ন করে।

-জানি তো, তোরা ফলই চিনিস না। অথচ এসব আমাদের দেশেরই ফল। এগুলো তো সবারই চেনাজানা থাকা দরকার।

-আচ্ছা ছোটন, গল্প করার অনেক সময় আছে! আগে নাশতা করে নে তো! এমনিতে তো ভিজে একশা হয়ে গেছিস। গরম গরম চা-নাশতা করলে ভালো লাগবে। খেতে খেতে গল্প করতে পারবি। আয় তোরা ডাইনিংয়ে এসে বস। বলতে বলতে মা ভেতরে চলে যান।

-চল, ডাইনিংয়ে চা খেতে খেতে তোদের বলছি। ছোটো মামা, দিপু, সুমি ডাইনিংয়ে এসে বসে।

দিপু ছোটো মামার ডান হাতে ছোটো একটা ঝাঁকি দিয়ে জানতে চায়,

-এতসব ফল কি আমাদের জন্য এনেছ মামা?

-হ্যাঁ অবশ্যই তোদের জন্য এনেছি। ছোটো মামা সবজি দিয়ে গরম লুচি মুখে পুরে দিতে দিতে জবাব দেয়।

-বললে না তো মামা, কোনটা কোন ফল। সুমির যেন তরই সইছে না।

ছোটো মামার প্লেটে গরম গরম আরো কয়েকখানা লুচি তুলে দিয়ে মা বলেন, কথার ফাঁকে ফাঁকে খেয়ে নে। দেখ আবার ঠান্ডা হয়ে না যায় যেন।

নাশতা সেরে ডাইনিংয়ের পাশের ঘরে ফল রাখা সানকিটার কাছে যায় মামা, দিপু ও সুমি।

-বলছি বলছি শোন। মামা একে একে ফলগুলো পরিচয় করিয়ে দেয়।

-এখানে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা তোরা চিনিস। এছাড়া রয়েছে লটকন, আমড়া, জাম্বুরা, জামরুল, ডেউয়া, কামরাঙা, কাউ, আর গাব। এবার চিনলে তো কোনটা কোন ফল!

-এতগুলো ফলের নাম কোনোদিন শুনিওনি মামা। দীপুর এ কথায় ছোটো মামা তাকে উদ্দেশ্য করে বলে- শোনো, তোমরা তো এখনো ছোটো। তুমি মাত্র ক্লাস ফোর-এ পড়ো। আর সুমি পড়ে ক্লাস টু'তে। তোমরা তো গ্রামের বাড়িতেও তেমন একটা যাও না। গ্রামে থাকলে বা সব সময় আসা-যাওয়া থাকলে দেশের ফল-পাখি এদের সাথে চেনাজানা হতো। তোমাদেরই বা দোষ কী বলো! শোনো দিপু-সুমি। আজ আমি যে ফলগুলো এনেছি, এ ফলগুলো হলো বর্ষার ফল। এ ফলগুলো বর্ষার ফল নামে পরিচিত বুঝলে?

-ওহ আচ্ছা! দিপু ও সুমি একসাথে মাথা দোলায়।

-তবে, আম আর কাঁঠাল কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মকালীন ফল। মজার বিষয় হলো, এই ফল দুটো বর্ষাকাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। আচ্ছা, তোমরা বলো তো, কয় প্রকারের ফল আছে এখানে? বলতেই দিপু ও সুমি সিলভারের বলের সামনে ঝুঁকে পড়ে গুনতে থাকে। গুনে দু'জনেই একসাথে বলে ওঠে,

-আম আর কাঁঠালসহ এগারো রকমের ফল, মামা।

-ঠিক বলেছ। একটা কথা কি জানো! এই প্রতিটা ফলের রয়েছে কিন্তু পুষ্টিগুণ। যা আমাদের সকলের শরীরের প্রোটিনের চাহিদা মেটায়। প্রতিটা ফল শরীরের চাহিদা মেটাতে সহায়ক এবং স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

-ওমা, তাই নাকি ছোটো মামা! দিপু অনেকটা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তোমাদের জেনে রাখা দরকার। আমি বলি, শোনো মন দিয়ে তোমরা।

পেয়ারা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য খুবই উপকারী এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া চোখের জন্য ভালো, পেটের জন্য উপকারী আর ক্যানসার প্রতিরোধী। শরীরের রক্তসঞ্চালন ঠিক রাখে। শরীরের বাড়তি ওজন কমাতে সাহায্য করে।

লটকন হলো ভিটামিন সি যুক্ত একটি ফল। লটকন ভিটামিন সি'র প্রভাবে রোগ-বালাই হতে মুক্ত রাখতে যেমন উপকারী তেমন শরীর সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে যথেষ্ট সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

সিলভারের সানকির একপাশ থেকে একটা সবুজ আমড়া হাতে নিয়ে মামা বলল, এই আমড়া দেখলে যে কারোরই জিভে জল এসে যায়। এই আমড়ায় দামি ফল আপেলের চেয়েও প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়রনের পরিমাণ বেশি। আমড়া দাঁতের গোড়া, দাঁতের মাড়ির প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া ইত্যাদিকে নিরাময় করতে সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

-মামা, পেয়ারা, লটকন আর আমড়াতে এত পুষ্টিগুণ! মনে হয় ওষুধের চেয়েও ভালো কাজ করে মামা!

তাই না মামা? দিপু মামাকে খুব আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করে।

-ঠিক তাই! পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ মৌসুমি ফল খেলে সত্যি কারোর শরীরে তেমন কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়। মামার কথার মাঝখানে সুমি জানতে চায়, -মামা এ ফলগুলোকে মৌসুমি ফল কেন বলা হয়?

-ভালো প্রশ্ন করেছ সুমি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তের আমাদের এই ছয় ঋতুর দেশে নানান ফল হয়ে থাকে। প্রতিটা ঋতুই এক একটা মৌসুম। আর এই প্রতিটা ঋতু-মৌসুমে যে যে ফল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটাকে মৌসুমি ফল বলা হয়।

বুঝলে তো মা মণি তুমি? আজ যে ফলগুলো আমি এনেছি, এগুলো বর্ষাকালীন বা বর্ষা মৌসুমের ফল। ও হ্যাঁ, আমরা বলছিলাম ফলের পুষ্টিগুণ ও উপকারিতার কথা। আর বাকি থাকল কী তাহলে?

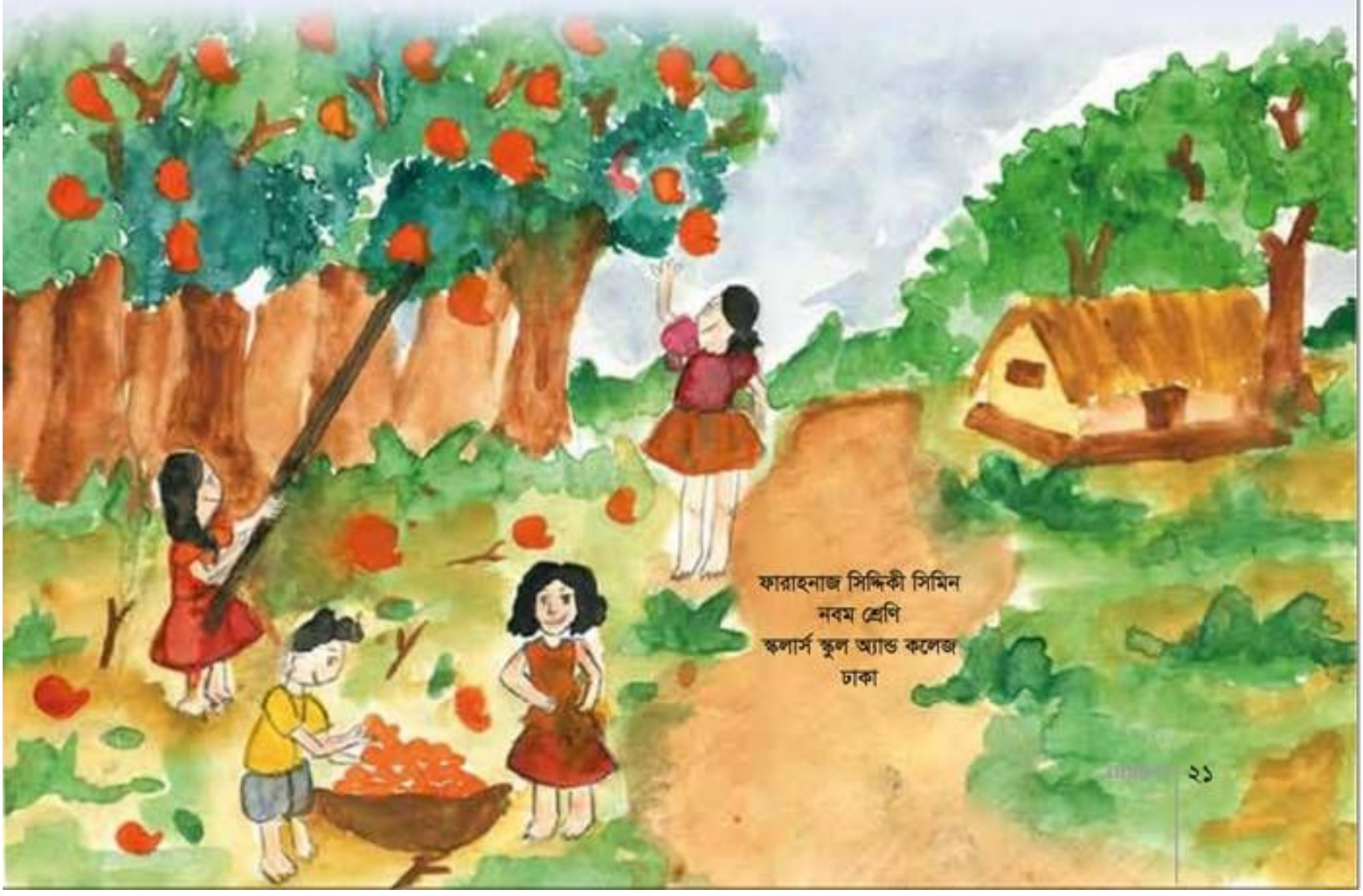

ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন
নবম শ্রেণি
স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এবার জাম্বুরার কথা বলি। জাম্বুরাটা হাতে নিয়ে মামা দিপু আর সুমির সামনে তুলে ধরে বলতে থাকে,

-এই জাম্বুরাতে রয়েছে বেশ পরিমাণে ভিটামিন। সাধারণত জ্বর বা কাশির জন্য খুবই উপকারী। মানুষের হার্টকে সুস্থ এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে এমনকি ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখে জাম্বুরা।

মামা একটা সাদা জামরুল ফল হাতে নিয়ে দেখিয়ে বলে, এই যে জামরুল ফল, দেখছ তো! এটা হজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী। পেট ফাঁপা, ডায়রিয়া প্রতিরোধে বিশেষভাবে কাজ করে। চোখের জন্যও খুব উপকারী জামরুল ফল। সাদা এবং গোলাপি বা লালচে রঙের জামরুল ফল দেখতে খুবই সুন্দর।

কী মামারা, তোমাদের ফলের গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে ভালো লাগছে নাকি লাগছে না?

-জানতে খুব ভালো লাগছে মামা। তুমি বলো শুনছি। খুব আগ্রহ করে বলল দিপু। সাথে পাশে থেকে সুমিও বলল, মামা আমার শুনতে ভালো লাগছে, বলো মামা।

এবার তাহলে ডেউয়া ফলের কথা বলি। মুখের রুচির জন্য ডেউয়া ফল খুব উপকারী। টক-মিষ্টির এই ডেউয়া ফল বমিভাব কমাতে, পেটের গণ্ডগোল থেকে রেহাই পেতে খুব ভালো উপকার পাওয়া যায়।

আশা করি তোমরা আগে থেকেই চেনো কামরাঙা। খেতে টক টক হলেও খুবই মজা করে খায় সবাই। কোষ্ঠকাঠিন্য, হজম, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ব্রণ, ফুসকুড়ি ইত্যাদির জন্য বেশ ফলদায়ক। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্যও কামরাঙা খুব ভালো কার্যকর। কামরাঙা খালি পেটে না খাওয়াই ভালো। গ্যাসের সমস্যা হতে পারে।

এই যে কাউফল দেখছ, এটা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভালো উপকার পাওয়া যায়। খিচুঁনি, ঠাণ্ডাজনিত আমাশয়, এবং অতিরিক্ত মাথা ধরা নিরাময়ে খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

-মামা, কাউফল আমি কোনোদিন খাইনি! বলে মামার হাত থেকে সুমি কাউফলটা ছোঁ মেরে নিয়ে নেয়।

–হ্যাঁ, তোমরা খাবে বলেই তো এনেছি। আজকে অবশ্যই খাবে।

এবার গাবের কথাই বলি তাহলে! গাবে রয়েছে যথেষ্ট পুষ্টিগুণ। গাব শারীরিক দুর্বলতা কমায়। ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্ত চলাচলের উন্নতি ঘটায়। হাইপারটেনশন কমায়। হজমে সহায়ক। ত্বকের যত্নে বেশ ভালো ভূমিকা রাখে।

-মামা, হাইপারটেনশন কী? চট করে সুমি প্রশ্ন করে।

-ভালো প্রশ্ন করেছ। মানুষের শরীরের বিভিন্ন বিষয় যেমন রক্তপ্রবাহ, কোলেস্টেরল, রক্তচাপ, হার্টঅ্যাটাক এবং স্ট্রোক এসব নানা উপসর্গ সবগুলোকে মিলিয়েই হাইপারটেনশন বলে। তোমরা তো এখনো ছোটো। এসব বিষয়গুলো তোমরা এখন হয়ত বুঝবে না সব। পড়ালেখা করে বড়ো হও, ধীরে ধীরে সব জানতে পারবে বুঝতে পারবে। তবে, একটা কথা মনে রেখো, মোসুমীর যে কোনো ফল আমাদের প্রত্যেকের খাওয়া উচিত। এই ফলগুলো যে মৌসুমে হয়, সে মৌসুমে খাওয়ার উপযোগী এবং শরীরের চাহিদার প্রয়োজন আছে বলেই প্রকৃতিগতভাবে এর সৃষ্টি। এ যে সৃষ্টিকর্তারই দান। আজ থেকে তোমরা একটা কথা জেনে রেখো যে, আমাদের শরীরের পুষ্টি চাহিদা মেটাতেই প্রতিটা মৌসুমের ফল খাওয়া উচিত।

-আচ্ছা, সেই কখন থেকে যে তোরা মামা-ভাগিনা ভাগিনি মিলে একটানা বকবক করছিস। দুপুর যে গড়িয়ে গেল। সেদিকে খেয়াল আছে? খেতে হবে না! ভেতর থেকে এসে মা জোড়ালো গলায় বলেন কথাগুলো। বাকি গল্প পরে হবে। এবার তো আয়, টেবিলে খাওয়া রেডি।

দিপু বলল: মামা- আম কাঁঠালের পুষ্টিগুণের কথা বললে না তো!

-ওহ্, হ্যাঁ সত্যি তো! আম-কাঁঠালের কথা বলা হয়নি। অবশ্যই বলব। তার আগে এসো হাত-মুখ ধুয়ে নিই। ছোটো মামা তার দু'পাশে দিপু ও সুমিকে হাত ধরে নিয়ে ডাইনিংয়ের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে বলেন, খেতে খেতে সে বিষয়ে না হয় আলাপ করা যাবে, চলো...।■

কবি ও প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সুস্বাদু ফল

অমিত কুমার কুণ্ডু

আম

আম খান রাজা-প্রজা আরো খান রানি
ফলের জগতে আম আজও খানদানি।

কাঁঠাল

দেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল তো রাজা
কোনোটা রসালো হয়, কোনোটা তো খাজা।

লিচু

টইটম্বুর? টইটম্বুর? রসে ভরা কী?
লিচু ছাড়া এমনটি আর কোথাও দেখিনি।

কালো জাম

মুখে দিলেই গাল হয়ে যায় লাল; জানো কী তার নাম?
দারুণ খেতে, থোকায় থোকায় ধরে; প্রিয় কালোজাম।

গোলাপজাম

ছেলেবেলার দিন কেটেছে গোলাপজামের শাখায়
ঠিক চিনেছি! গোলাপজাম? তোমার ছোটো ঝাঁকায়?

জামরুল

গাছে উঠে পেড়ে খেতো আমাদের কামরুল
সাদা সাদা কী সেটা? জামরুল, জামরুল।

আতা

টিয়া পাখির পছন্দ খুব: ঠুকরে দিলেই যা-তা!
কী ফল সেটা? কী ফল সেটা? সবার প্রিয় আতা।

বেল

ন্যাড়া একবারই যায় জানি বেলতলা
পেট রোগাদের বেল খেতে হয় বলা।

আনারস

এক আনা নয়, দুই আনা নয়, ষোলো আনারস
মুকুট পরা ফল আমাদের রসের আনারস।

তরমুজ

গরমে শান্তি পাবে; যদি খাও তরমুজ
তৃষ্ণা মিটবে খেলে ফুটি, বাঙ্গি, খরমুজ।

কলা

চম্পা, চাপা, সবরি, সাগর যখন যেটা পায়
আরাম করে খায় হনুমান, আয়েশ করে খায়।

ডালিম

কেউ বেদানা, কেউ বা আনার, কেউ বা ডাকে ডালিম
ডালিম খেতে লাগে না তো কোনোরকম তালিম।

নালিম

চাল কুমড়ার মতো, ঝুলে বানে বানে
নালিম মজার ফল, খেতে মন টানে।

বাঙ্গি

বাঙ্গি খেতে কে না চায়, দিয়ে গুড়-চিনি
মন চায় বাঙ্গি পেলে এক্ষুণি কিনি।

তেঁতুল

গল্প শুনি তেঁতুল গাছে থাকে ভূতের বাসা
যা থাকে থাক, তেঁতুল দিয়ে আচারটা হয় খাসা।

কুল

ছেলেবেলায় গাছে উঠে পেড়ে খেতাম কুল
বরই গাছের কাঁটা তো নয়; ফুটিয়ে দিত হুল।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পেঁপে
পাখি পাকা পেঁপে খায়। খাই তুমি-আমিও
চাচা-চাচি-ফুফু খায়, খায় মামা-মামিও।

রামবুটান
বিদেশ থেকে এসে গেছে, ফলটা নতুন, রামবুটান
বাংলাদেশেই পাবে, যাওয়া লাগবে না তো চীন-ভুটান।

আঙুর
যে পারে না লক্ষ্য ছুঁতে, তার কাছে ফল আঙুর টক
আঙুর দারুণ সুস্বাদু ফল, নিন্দা যতই করুক ঠক।

পেয়ারা
আপেল তো নয়, নাশপাতি নয়, নয় তো কোনো স্ট্রবেরি
অনেক মজার পেয়ারা ফল, তার কাছে তো তুচ্ছ চেরি।

আমলকী
ঔষধি গুণে ভরা দেশি ফল আমলকী
ত্রিফলা হয়, মিলে বহেরা ও হরিতকি।

কদবেল
মিষ্টি বা টক নয়, নয় তেতো কদবেল
সকলেই খায়, যারা করে পাস বা করে ফেল।

নারিকেল
ডাব খাবে? নাড়ু খাবে? মাথায় মাখবে তেল?
তাহলে এ বর্ষায়, গাছ পোঁতো নারিকেল।

কামরাঙা
ভেতর-বাহির পুরোটা ফল, হলুদ রঙে রাঙা
সে আমাদের দারুণ প্রিয়, কামরাঙা, কামরাঙা।

জলপাই
আচার ও তেল পাই; কোনো গাছে ফল পাই?
সে তো আর কিছু নয়; জলপাই, জলপাই।

তাল
কাঁচা খেলে তালের শাঁস; পাকলে তালের বড়া
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা হয় তো তৈরি করা।

শাক আলু
রাঙা আলু নয়, গোল আলু নয়, নামটি তাহার শাক আলু
ঠিক ফল নয়, সবজিও নয়, ফলতে লাগে মাটি-বালু।

পানিফল
পানির মধ্যে হয়, নাম তাই পানিফল
এই ফল চাও যদি, সাঁতরাতে হবে জল।

আমড়া
কাজ পারে না, তাই তো বলি-'আমড়া কাঠের ঢেঁকি'
আমড়াজুড়ে ভিটামিন সি, তথ্যটি নয় মেকি।

খেজুর
পুষ্টিগুণে সবার সেরা, মরুর দেশের ফল
খেজুর খেতে চল রে তোরা, খেজুর খেতে চল।

লেবু
পেলে খাও জাম্বুরা, শরবতি, 'কাগুজে'
ভিনদেশি মাল্টা, কমলা, না খুঁজে।

ড্রাগন
ক্যাকটাস গাছে ধরে, ভিনদেশি ড্রাগন
চাষ তো হচ্ছে দেশে। জানিস না? তবে শোন।

লটকন
ডুমুর যেমন দেখতে তেমন; ডুমুর তো নয় লটকন
লটকন খেতে টানে নাকো মন; এ রকম আছে কোন জন?

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বঙ্গবন্ধুর
জন্মশতবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে

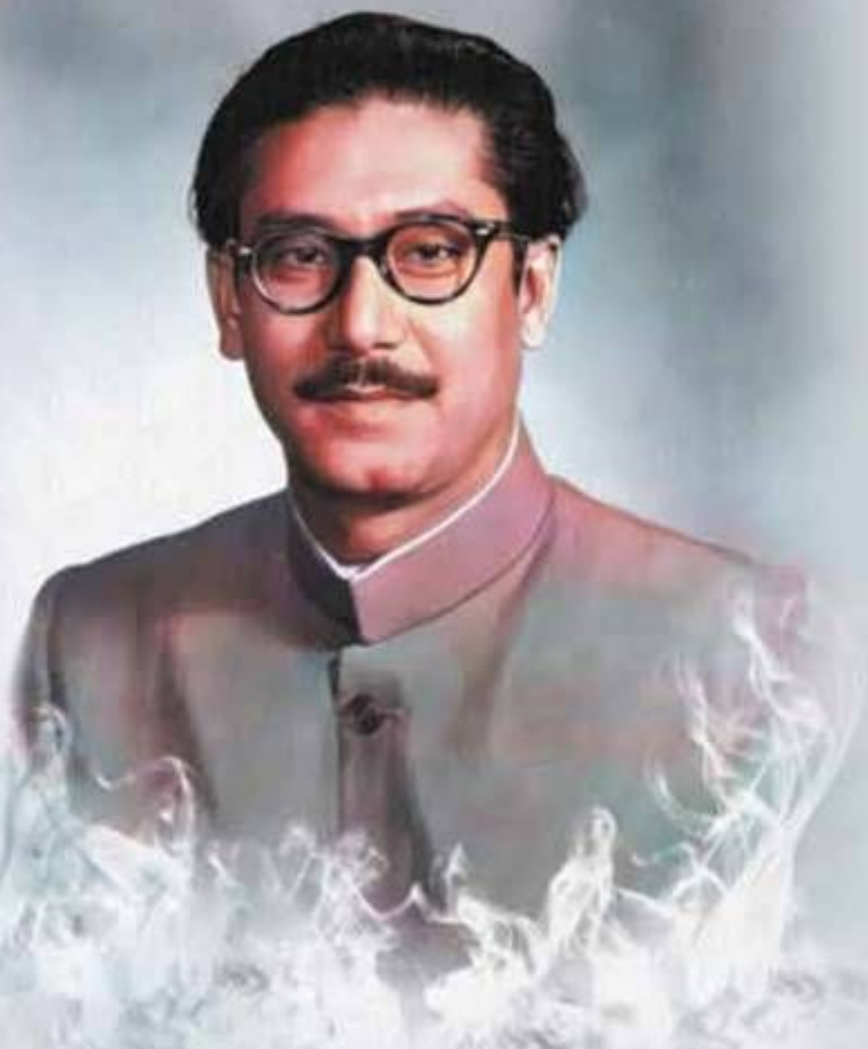

মহান নেতা

মো. মশিউর রহমান

অমর অবিস্মরণীয় তিনি
রাজনীতিরও মহাকবি
লাল-সবুজের পতাকায়
মিশে আছে তাঁর উজ্জ্বল ছবি।

তাঁর জন্মে ধন্য আমরা
ধন্য আমাদের মাতৃভূমি
তাঁর জন্যেই পেয়েছি
স্বাধীনতার জয়ধ্বনি।

খোকা

জাওয়াদুল আলম

খোকা নামের একটি শিশু
জন্মেছিলেন টুঙ্গিপাড়া গ্রামে,
সবাই তাঁকে চিনে এখন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর নামে।

ছোটোকাল থেকে তিনি
মানুষকে খুব ভালোবাসতেন
বিপদে-আপদে সবার জন্য
অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

৭ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গ্রীষ্মকালীন ফল

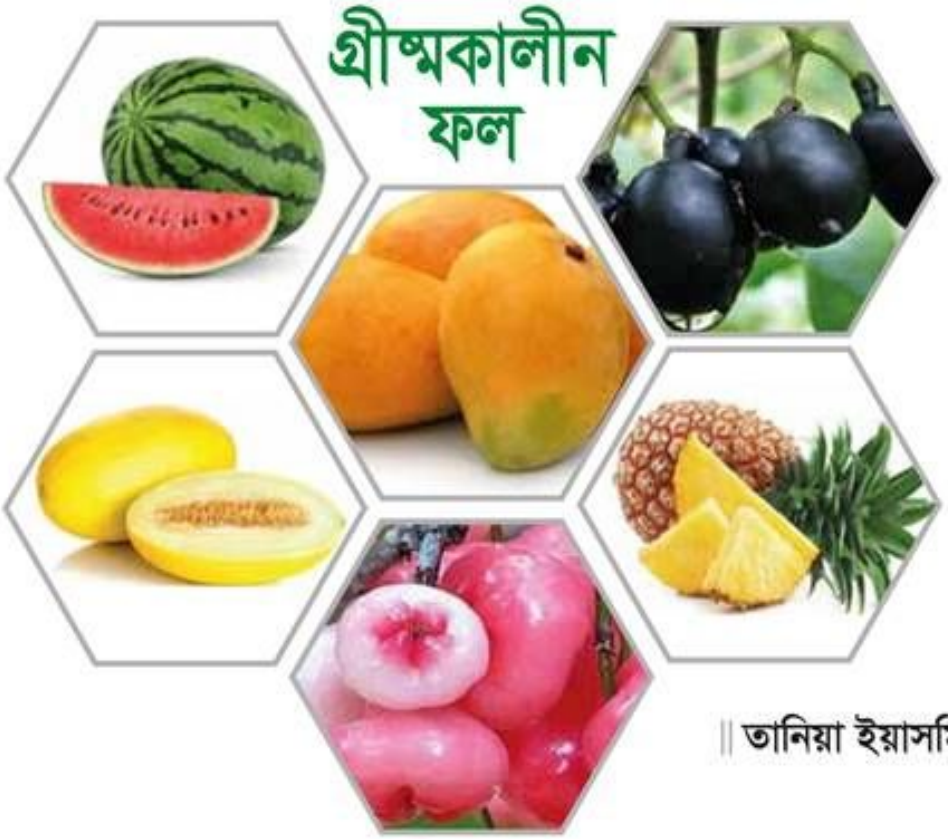

|| তানিয়া ইয়াসমিন ||

ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় অপরূপ দেশ বাংলাদেশ। প্রত্যেক ঋতুর রয়েছে আনন্দ-উচ্ছল ভরা এক একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এবারের নবারুণ সংখ্যা নানারকম ফল নিয়ে সাজানো হয়েছে। গ্রীষ্মকাল বছরের প্রথম ঋতু। এই ঋতু নিয়ে আসে নানা রং বাহারি ফল। হাতের কাছের মজাদার এসব রসালো ফলগুলো ও তার পুষ্টি সম্পর্কে জেনে নিই তাহলে।

আম: আম পছন্দ করে না এমন মানুষ পাওয়া দুস্কর। আম কাঁচা পাকা দুই অবস্থায়ই খাওয়া যায়। আর পাকা আমের স্বাদ যেমনি মজাদার তেমনি এর গুণাগুণও অনেক। আমকে ফলের রাজা বলা হয়। সারাদেশেই আম পাওয়া যায়। তবে রাজশাহী ও চাঁপাইনাবাবগঞ্জে সবচেয়ে বেশি আম উৎপাদন হয়। আমের রয়েছে নানা জাত। সুস্বাদু আমে রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিন এসিড, ভিটামিন-এ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিটা ক্যারোটিন। এটি ক্যানসার ও হৃদরোগ থেকে রক্ষা করে। ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিক রাখে এমনকি ত্বকের উজ্জ্বলতাও বাড়ায়।

কাঁঠাল: কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। এটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও মিষ্টি ফল। আমাদের দেশের গাজীপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি কাঁঠাল পাওয়া যায়। কাঁঠাল নানা আকৃতির হয়। যেমন ছোটো, বড়ো, গোলাকার, বাঁকা ইত্যাদি। কাঁঠালের কোনো কিছুই যেন ফেলনা নয়। প্রচুর পুষ্টিগুণ। কাঁঠাল ক্যানসার ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, রাতকানা, টেনশন, অতিরিক্ত ওজন, ম্যালেরিয়া সর্দিজ্বর ইত্যাদির জন্যও অত্যন্ত উপকারী। শরীরের হাড়ের সঠিক গঠনের জন্যও কাঁঠাল অত্যন্ত উপকারী। এছাড়া কাঁঠালের রয়েছে অনেক ভেষজগুণ।

লিচু: গ্রীষ্মকালীন ফলের মধ্যে লিচু একটি জনপ্রিয় ফল। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সব জায়গায় লিচু ভালো ফলন হয় না। যেমন রাজশাহী, ইশ্বরদী, দিনাজপুরে লিচুর ফলন ভালো হয়। রসালো শাঁসযুক্ত ছোটো ছোটো এই ফলের বহিরাবরণ অমসৃণ ও লালচে গোলাপি রঙের। যা খাওয়া যায় না। ভেতরে সুমিষ্ট রসালো শাঁস খেতে হয়। লিচুতে ভিটামিন-সি ও ক্যালসিয়াম পর্যাপ্ত থাকে। এছাড়া অন্যান্য খনিজ উপাদানগুলো হলো আয়রন, ফলিক এসিড, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

জামরুল: আমাদের কাছে বেশ পরিচিত একটি ফল জামরুল ফলটি দেশের প্রায় সব জায়গায়ই পাওয়া যায়। জামরুল লাল ও সাদা ২ রঙের হয়। লাল জামরুল দেখতে খুব সুন্দর। তবে এখন মিষ্টি স্বাদের জামরুলও পাওয়া যায়। এই মূলত দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব মালয়েশিয়ার ফল। জামরুল কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দূর করে, ক্যানসার প্রতিরোধ করে, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে, লিভার সুস্থ রাখে, চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতে জামরুলের ভূমিকা অনন্য। অনেকে এই ফলকে সাদা জাম, অনেকে আমরোজও বলে। প্রকৃতি যত বেশি রোদ তপ্ত থাকে জামরুল তত মিষ্টি হয়।

আনারস: আমকে যদি ফলের রাজা বলা হয় আনারস তাহলে ফলের রানি। কেননা রানি মাথায় মুকুট পরে। গবেষকদের ধারণা আনারসের উৎপত্তিস্থল ব্রাজিলে। আনুমানিক ১৫৪৮ সালে আমাদের এ অঞ্চলে আনারস এসেছে। পাকা আনারসের অম্ল, মধুর রসালো মিষ্টি গন্ধ হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আনারস নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মজাদার ও রসালো ফল। আনারসের জুস, স্লাইস, স্কোয়াশ, সিরাপ জ্যাম, জেলি, ভিনেগার, সাইট্রিক এসিড বিশ্ব বিখ্যাত। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস যা শরীরের পুষ্টির অভাব দূর করে। ওজন নিয়ন্ত্রণ করে। হাড় গঠনে সহায়তা করে। দাঁত ও মাড়ির সুরক্ষায় কাজ করে। হজমশক্তি বাড়ায়ও, রক্তজমাট বাঁধতে বাধা দেয়। এছাড়া জ্বর, সর্দি কাশিতেও দারুণ ফল দেয় আনারস। উঁচু জমিতে আনারস ভালো হয়। আমাদের দেশে আনারস তাজা পাকাফল হিসেবে খাওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে উৎপাদিত আনারসের বেশিরভাগই প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

জাম: ফলের ভাণ্ডারে ভরা বাংলাদেশের জাম অনন্য। জাম খুব কম সময় থাকে। আমাদের দেশের ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা , গাজীপুর অঞ্চলে জাম বেশি উৎপন্ন হয়। জাম তাজা ফল হিসেবে খাওয়া হলেও এ থেকে রস, স্কোয়াশ হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। জামে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, জিংক, কপার, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ ফ্রুকটোজ। ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসহ অসংখ্য উপাদান।

বাঙ্গি বা ফুটি: এক রকমের শশা জাতীয় ফল। ছোটো লম্বাটে জাতকে চিনাল বলা হয়। ফুটি বেশ বড়ো আকারেরও হয়। এটি কাঁচা অবস্থায় সবুজ ও পাকলে হলুদ রঙের হয় এবং ফেটে যায়। এর বাইরের দিকটা অনেকটা মিষ্টিকুমড়ার মতো খাঁজকাটা ও হালকা ডোরাকাটা। খেতে হালকা মিষ্টি। কোনোটা বেলে কোনোটা আবার কচকচে স্বাদের হয়। এর ভেতরটা ফাঁপা থাকে। বাঙ্গির বৈজ্ঞানিক নাম Cucumis melo. ইংরেজি নাম Melon তবে বাঙ্গিতে রয়েছে প্রচুর খাদ্য আঁশ যা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। এটি সাধারণত বেলে মাটিতে জন্মায়। ■

সৈয়দ ফারহান জিম, অষ্টম শ্রেণি, সানিডেইল স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বর্ষার ফল বন্দনা

শাহানা আফরোজ

বিলিম্বি: অক্সিডেসি গোত্রের অন্তর্গত এই ফল কামরাঙার নিকট আত্মীয়। এর স্বাদও অনেকটা কামরাঙার মতোই। ইংরেজি নাম Bilimb বৈজ্ঞানিক, নাম Averrhoa bilimbi বিলিম্বি দেখতে অনেকটা পটলের মতো, তবে আরো ছোটো প্রায় ৩-৬ সে.মি। রং উজ্জ্বল, হালকা সবুজ। বিলিম্বি গাছে

প্রচুর ফল আসে এবং ধরে খুবই অদ্ভুতভাবে। গাছের ডালে তো বটেই, কাণ্ড ঘিরেও ফল হয়। বিলিম্বি কাঁচা খাওয়া হয়। ঝাল-লবণ দিয়ে খেতেও ভালো লাগে। ছোটো মাছ ও ডালের সঙ্গে বিলিম্বির জুড়ি নেই। ফলটি কাঁচা অবস্থায় খুব টক হলেও রান্নার পর বা চাটনি কিংবা আচার তৈরি করার পর টক থাকে না। বিলিম্বি পুষ্টিগুণে ভরপুর। আমিষ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম লৌহ, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ক্যারোটিন, নিয়াসিন ইত্যাদি।

কাউফল: নামটা কাউ হলেও, টক-মিষ্টি স্বাদের ফল এটি। উপকূলীয় অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে শিশুদের অনেক প্রিয় এই ফল। ভিটামিন-সি তে ভরপুর কাউ ফলে আছে সর্দি-জ্বর ও ঠাণ্ডা সারাবার মতো ভেষজ গুণাগুণ। দিন দিন তাই বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে এই কাউ ফল। কাউয়ের বৈজ্ঞানিক নাম- Gracinia cowa Roxb বা Gracinia idia Roxb. ইংরেজিতে- Cowa (mangosteen) বলা হয়। আকারে ছোটো কমলালেবুর মতো মোটা বাকলযুক্ত ফলের ভেতর চুষে খাওয়ার মতো রসালো দানা থাকে চার-পাঁচটি। পাকলে কমলা-হলুদ হয়। পুষ্টিগুণে ভরা ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ এই কাউফল মুখের অরুচি দূর করে। পরিমিত ক্যালরি সমৃদ্ধ চর্বি, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি-বিকাশে ও রোগ প্রতিরোধে এই ফলের প্রয়োজনীয়তা অনেক।

লুকলুকি: গ্রাম-বাংলার চিরচেনা অপ্রচলিত একটি ফলে নাম লুকলুকি। কেউ বলেন টিপ ফল। ফলটি স্বাদের দিকে টক মিষ্টি। অঞ্চল বিশেষে অন্য নামও আছে- টিপফল, টিপটিপানি, টিপাটিপি, পেলাগোটা, প্যালা, পায়েলা, ঝিটকি, পলাগোটা, টরফই, পাইন্যাগুলা, বেহুই, পানিয়ালা, পানি আমলা, পাইন্না, ইত্যাদি। গাছটি নিতান্তই দুর্লভ। লুকলুকির বৈজ্ঞানিক নাম : ফ্লাকোর্টইয়া ক্যাটাফরাসিটা (Flacourtia cataphracta), এর ইংরেজি নাম : ইন্ডিয়ান প্লাম (Indian plum)। ফল গোলাকার মার্বেলের মতো, খোসা পাতলা ও মসৃণ। কাঁচা অবস্থায় সবুজ। কাঁচা ফলও খাওয়া যায় তবে কাঁচা কষ্টি কষ্টি অ-স্বাদ। ফল পাকলে লালচে বেগুনি রঙের হয়। পাকা ফলের ভেতরটা বাদামি বা কালচে গোলাপি রং ধারণ করে। টিপাফল পাকার পরে টিপে নরম করে খেতে দারুণ মজা। এ কারণে টিপ ফল নামকরণ হয়েছে। নানা ওষুধিগুণ সম্পন্ন এই ফলে রয়েছে। হজম শক্তি, আয়রন,

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি।

করমচা : টক স্বাদের ছোটো আকৃতির একটি ফল। ইংরেজিতে একে Bengal currant ev Christ's thorn বলা হয়। Carissa গণভুক্ত কাঁটাময় গুল্মজাতীয় করমচা কাঁচা ফল সবুজ, পরিণত অবস্থায় ম্যাজেন্টা লাল-রং ধারণ করে। অত্যন্ত টক স্বাদের এই ফলটি বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। করমচা ফল হিসেবে বেশ অবহেলিত হলেও এর পুষ্টিগুণ কিন্তু মোটেও অবহেলা করার মতো না! করমচাতে কোনো ফ্যাট বা কোলেস্টেরল নেই। তাই ডায়াবেটিস ও হার্টের রোগীদের জন্য এ ফল খুব উপকারী। করমচা ওজন কমাতেও সাহায্য করে। ভিটামিন সি-তে ভরপুর করমচা খাবারে রুচি বাড়ায়।

আমড়া: বৈজ্ঞানিক নাম Spondias pinnaata Kurz. ev Spondias mombin, পরিবার Anacardiaceae। কাঁচা ফল টক বা টক মিষ্টি হয়, তবে পাকলে টকভাব কমে আসে এবং মিষ্টি হয়ে যায়। ফলের বীজ কাঁটাযুক্ত। এই ফল কাঁচা ও পাকা রান্না করে বা আচার বানিয়ে খাওয়া যায়। আমড়া কষ ও অম্ল স্বাদযুক্ত ফল। এতে প্রায় ৯০% জল, ৪-৫% কার্বোহাইড্রেট ও সামান্য প্রোটিন থাকে। আমড়ায় যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন সি পেকটিন জাতীয় ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট জাতীয় উপাদান থাকে।

ডেউয়া: বিচিত্র দেশীয় ফলের মধ্যে অন্যতম টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফলটি আমাদের দেশের অনেকের কাছেই খুব পছন্দের। ডেউয়া ফলটি গোলাকৃতির, ২-৫ ইঞ্চি চওড়া হয়, পাকলে হলুদ রং ধারণ করে। বৈজ্ঞানিক নাম আর্তকার্পাস লাকুচা (Artocarpus lacucha). ইংরেজি নাম মনকে জ্যাকফ্রুট (monkey jackfruit)। ফলটি কাঁঠালের মতো যৌগিক বা গুচ্ছফল। বহিরাবরণ অসমান। কাঁচা ফল সবুজ, পাকলে বহিরাবরণ হলুদ। ভেতরের শাঁস লালচে হলুদ। ফলের ভেতরে থাকে কাঁঠালের ছোটো মতো কোয়া এবং তার প্রতিটির মধ্যে একটি করে বীজ থাকে। ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়ামের আধার বলা হয় ডেউয়া ফলকে। এগুলো ছাড়াও ডেউয়া ফলে রয়েছে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান।

গোলাপজাম: আমাদের দেশের অপ্রচলিত ফল গোলাপজাম। দেখতে সুন্দর অবয়ব, ফিকে হলুদ কিংবা হালকা গোলাপি রং, মিষ্টি স্বাদ। গোলাপ ফুলের সুগন্ধযুক্ত ফলটি খেতে তেমন মজা না। তবে এই ফলে প্রায়

সব ধরনের পুষ্টি উপাদানই আছে। গোলাপজাম এর ইংরেজি নাম Malabar plum, Rose apple, Gulab Jamun ইত্যাদি। গোলাপজামের বৈজ্ঞানিক নাম Syzygium jambos। গোলাপজাম কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে। পাকতে শুরু করলে ধবধবে সাদা অথবা সাদাটে হলুদ হয় বা শুধুই হলুদ হয়। কাঁচা ফল খেতে টক হলেও পাকা ফল মিষ্টি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সাতকরা: বৈজ্ঞানিক নাম: Citrus macroptera। Rutaceae পরিবারের সাইট্রাস গণের অন্তর্ভুক্ত লেবু জাতীয় ফলের গাছ সাতকরা। এটি সিলেটের স্থানীয়

ফল। বিশেষ ঘ্রাণযুক্ত লেবু জাতীয় এক প্রকার টক ফল, সাতকরা সবজির আনুষঙ্গ হিসেবে রান্নায় ব্যবহার করা হয়। গরুর মাংস, মাটন এবং মাছের তরকারিতে দিয়ে রান্না করা হয়। ভারতের আসামের পাহাড়ি এলাকার আদি ফল এটি যা বর্তমানে বাংলাদেশের সিলেটের জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাটের জাফলং ছাড়াও এখানকার পাহাড়-টিলায় চাষ হয়। এর পুষ্টিমান অনেক উন্নত। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস।

পানিফল: অনেকে একে বলে শিংড়া। বৈজ্ঞানিক নাম– Trapa natans । Gwu Trapaceae পরিবারের একটি বর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ। এটি ৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পানির নিচে মাটিতে এর শিকড় থাকে এবং পানির উপর পাতাগুলো ভাসতে থাকে। ফলে শিং এর মতে কাঁটা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোলাইনা এবং ওয়াশিংটনে পানিফল উদ্ভিদকে অনেক সময় জলজ আগাছা হিসবে গণ্য করা হয়। ■

ফলের ছড়া

তাহমিনা জিনাত

কাঁঠাল মোদের জাতীয় ফল
ফলের রাজা আম
ছোট্ট শিশু মুখ রাঙিয়ে
খেয়েছে সে জাম।
লিচু আমার অনেক প্রিয়
খেতে ভারি মজা
কাঠবিড়ালি লেজ উঁচিয়ে
গাছে উঠে যায় সোজা।
তরমুজ সে-তো সবার প্রিয়
গরমেতে আরাম
পেঁপে খেতে ভালো লাগে
দূর হয় অনেক ব্যারাম।

একাদশ শ্রেণি, রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রোদ-বৃষ্টির খেলায় শরতের ফল

তৈয়ুবুর রহমান

ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস শরৎকাল। ইংরেজিতে একে 'অটাম' বলা হয়। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় এই ঋতুকে ফল হিসেবে ডাকা হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা এই ফল ঋতুতে কি কি ফল পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জানাব।

তাল: ভাদ্র মাস এলেই মনে পড়ে তালের কথা আমাদের দেশে তাল অতি পরিচিত। তালের ফল ও

বীজ দুই-ই বাঙালির জনপ্রিয় খাবার। পাকা তালের ঘন রস যেমনি ঘ্রাণ তেমনি সুমিষ্ট। রস থেকে নানা রকম পিঠা, পায়েস তৈরি করা হয়। তাল কাঁচা অবস্থায় এর ভিতরের বীজ যেটা তালশাঁস নমে পরিচিত, যা খেতে অত্যন্ত মজাদার। এই তালশাঁস ছোটো-বড়ো সবারই পছন্দের। তালে আছে ভিটামিন 'এ' বি ও সি, জিংক, পটাসিয়াম, আয়রন ক্যালসিয়াম ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক খনিজ উপাদান।

গাব: গাব একটি দেশীয় ফল। এটি সুস্বাদু মিষ্টি ও কোষযুক্ত ফল। পাকা গাবের রং টকটকে লাল। বিলাতি গাব ইউরোপে কাটার ফ্রুট বা ভেলভেট

আপেল নামে পরিচিত। গাবের মিষ্টি ঘ্রাণ মুহূর্তেই মন কেড়ে নেয়। ভেতরে দুধ সাদা এ ফল খেতে বেশ মিষ্টি এবং মুখে দিলেই মাখনের মতো গলে যায়। পাকা অবস্থায় এর ভিতরের বীজগুলো চুষে খেতে হয়।

চালতা: চালতাকে বাংলায় চালিতা বা চাইলতে বলে। এর বৈজ্ঞানিক নাম Dillenia indica। ইংরেজি নাম Elephant Apple। এর জন্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এ গাছ উচ্চতায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ ফল স্বাদে টক। চালতার আচার, চাটনি, টক ডাল প্রিয় খাদ্য। আবার পাকা ফল পিষে লবণ মরিচ দিয়ে খেতে বেশ লাগে। গ্রামের জঙ্গল ও বাড়ির উঠানে এ

গাছ দেখা যায়। ঠান্ডা, জ্বর, বাতের ব্যথা, রক্ত আমাশয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও মুখে ঘা অথবা চামড়া উঠে গেলে এটি খেলে তাড়াতাড়ি সারে।

অরবরই: 'অড়বড়ই' বা 'অরবড়ই' একটি ছোটো অপ্রচলিত টক ফল। এর ইংরেজি নাম 'Otaheite gooseberry', 'Malay gooseberry', 'Tahitian gooseberry', 'country gooseberry', 'star gooseberry', 'West India gooseberry' ইত্যাদি। অরবরই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Phyllanthus acidus, যা 'Phyllanthaceae' পরিবারভুক্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই ফলটিকে নলতা, লেবইর, ফরফরি, নইল, নোয়েল, রোয়াইল, রয়েল, আলবরই, অরবরি ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

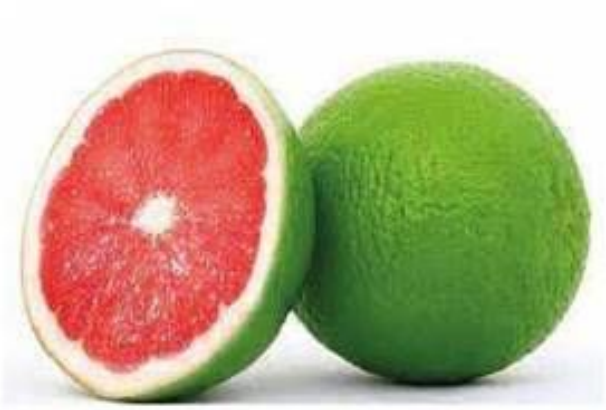

ফলটির ব্যাস ০.৫ থেকে ১ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। দেখতে হালকা হলুদ রঙের এই ফলের ত্বক খাঁজ কাটা থাকে। বাংলাদেশে এই ফলকে নইল এবং রয়েল নামেও ডাকা হয়। এ ফল প্রচুর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এতে প্রচুর পানি থাকে বেশি তৃষ্ণার্ত থাকলে এটা খেলে কিছুটা তৃষ্ণা নিবারিত হয়ে। লবণ দিয়ে খেতে খুবই স্বাদ লাগে অরবড়ই। ডালে দিয়েও রান্না করা য়ায়। তাছাড়া এর আচার খুবই সুস্বাদু।

জাম্বুরা: জাম্বুরা বা বাতাবিলেবু এক প্রকার টক-মিষ্টি জাতীয় ফল। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের এটি অত্যন্ত পরিচিত ফল। বিভিন্ন ভাষায় এটি পামেলা, জাবং ও শ্যাডক ইত্যাদি নামে পরিচিত। এর আদিবাস দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে জাম্বুরাই সবচেয়ে বড়ো হয়। এর খোসা বেশ মোটা এবং ফোমের মতো নরম। ভিতরের শাঁস লাল সাদা আবার কিছুটা হলুদ বর্ণেরও হয়। বাতাবি লেবুর কোষ লবণ, মরিচ, চিনি দিয়ে মাখিয়ে খাওয়া যায়, আবার জুস করে খাওয়া যায়। ■

প্রাবন্ধিক

লটকন

জাকির হোসেন

লটকন এক প্রকার টক মিষ্টি ফল। এটি নটকোনা, হাড়ফাটা, ডুবি, বুবি, কানাইজু, লটকা, লটকাউ, কিছুয়ান ইত্যাদি নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নাম Baccaurea motleyana)। দক্ষিণ এশিয়ায় বুনো গাছ হিসেবে জন্মালেও বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বাণিজ্যিক চাষ হয়। ছায়াযুক্ত স্থানেই এটি ভালো জন্মে। এর ফল টক স্বাদযুক্ত। আষাঢ- শ্রাবণ মাসে এটি পরিপক্ক হয়। এটি ৯-১২ মিটার লম্বা হয়। ফলের আকার দুই থেকে পাঁচ সেমি হয়, যা থোকায় থোকায় ধরে। ফলটি দেখতে হলুদ। এতে ২-৫ টি বীজ হয়, বীজের গায়ে লাগানো রসালো অংশ খাওয়া যায়।

বাংলাদেশে অপ্রচলিত ফল ছিল লটকন। কিন্তু এখন বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এদেশের নরসিংদীতেই লটকনের ফলন বেশি। লটকন এখন বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। লটকনে কোনো ক্ষতিকর উপাদান নেই। ছোটো-বড়ো সবাই এই ফলটি খেতে পারে। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান আছে লটকনে। আছে ভিটামিন সি। যা ত্বক, দাঁত ও হাড় সুস্থ রাখে। দিনে ২-৩ টা খেলেই শরীরে দৈনিক ভিটামিন সি'র চাহিদা পূরণ হয়। এ ছাড়াও শারীরিক দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় করা, হাত-পায়ে ব্যথা, ঠোঁট এবং পায়ের তালু ফাটা, ঠোঁট ও মুখের ঘা এবং বারবার গলা শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যায় যারা ভুগছেন লটকন তাদের জন্য আদর্শ একটি পথ্য। রক্ত ও হাড়ের জন্য বিশেষ উপকারী লটকন। কারণ এতে থাকে আয়রন। প্রতি ১০০ গ্রাম লটকনে ৫.৩৪ মি.গ্রা আয়রন থাকে। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

হেমন্তের ফল কথন

শাহনাজ সুলতানা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা আমাদের এই বাংলাদেশ। লাল-সবুজের এ দেশে প্রতি দু'মাস অন্তর অন্তর এক একটি ঋতু আসে। সেজে উঠে নিজস্ব বৈচিত্র্যতা নিয়ে। আর এ ষড়ঋতুর অনন্য ঋতু হলো রূপের রানি সুখের বাণী পরম প্রিয় হেমন্তকাল। স্নিগ্ধ হেমন্তকাল আমাদেরকে একটু বেশিই বিমুগ্ধ করে। বাংলাদেশের মাটি খুবই উর্বর। সামান্য পরিশ্রমেই ফলমূল ফলানো যায়। উপহার দেয় রূপ, রস, গন্ধেভরা সুস্বাদু নানা ফল। হেমন্তে বিভিন্ন ধরনের ফলের সমারোহ ঘটে। বন্ধুরা, এ ঋতুর বিশেষ কিছু ফলের কথা তুলে ধরছি তোমাদের জন্য।

কামরাঙা: কামরাঙার ইংরেজি নাম Carambola, এটি আবার Starfruit নামেও পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-প্রশান্ত এবং পূর্ব-এশিয়ার জনপ্রিয় ফল। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২ থেকে ৬ ইঞ্চি এবং উপবৃত্তাকার আকৃতির। সাধারণত পাঁচটি বিশিষ্ট

অনুদৈর্ঘ্য ঢাল থাকে, এর ত্বক পাতলা, মসৃণ, ও মোমের মতো হয় এবং পাকলে হলুদাভ হালকা রং ধারণ করে। ভিটামিন এ ও সি'র ভালো উৎস কামরাঙা। কামরাঙা দেশে দেশে নানাভাবে খাওয়া হয়। দক্ষিণ এশিয়াতে চিনি দিয়ে এবং চীনে মাছ দিয়েও রান্না করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় রান্না হয় সবজি হিসেবে। জ্যামাইকায় কামরাঙা শুকিয়ে খাওয়া হয়। তবে কিডনি রোগীদের এ ফল না খাওয়াই ভালো। এছাড়াও কামরাঙায় পাওয়া যায় ভিটামিন এ, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিঙ্ক। কামরাঙা ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, জ্বর ও মুখে রুচি ফেরাতে উপকারী। উচ্চ রক্তচাপে, ত্বকের সৌন্দর্য, মাথাব্যথা কিংবা হাড়ের ব্যথা উপশমেও কামরাঙার জুড়ি নেই।

ডালিম: বেদানা, আনার বা ডালিমের বৈজ্ঞানিক নাম Punica granatum, ইংরেজি নাম pomegranate। এটি Lythraceae পরিবারের। আদি নিবাস ইরান এবং ইরাক। পরবর্তীতে ভারত উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে। হিন্দুস্তানি, ফার্সি ও

পশতু ভাষায় বলে আনার। কুর্দি ভাষায় হিনার এবং আজারবাইজানি ভাষায় একে নার বলা হয়। সংস্কৃত এবং নেপালি ভাষায় বলা হয় দারিম। এ গাছ গুল্ম জাতীয়, লম্বায় ৫-৮ মিটার হয়। পাকলে লাল রঙের হয়। খোসার ভিতরে লাল রঙের দানা খেয়ে থাকে। এ ফল আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী চিকিৎসায় পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডালিম খেলে শরীরে রক্ত বৃদ্ধি পায়। গাছের শিকড়, ছাল ও ফলের খোসা দিয়ে আমাশয় ও উদরাময় রোগের ওষুধ তৈরি হয়। ডালিম গাছের শিকড় ক্রিমিনাশক। ডালিম গাছের মূল বা শিকড় থেকে ছাল নিয়ে চূর্ন করে চুনের পানির সাথে মিশিয়ে সেবন করলে আনায়াসেই ক্রিমিনাশ হয়। ডালিম গাছ- ফল, ফলের খোসা, পাতা থেকে শুরু করে শিকড় পর্যন্ত কোনোটাই ফেলনা নয়। আগাগোড়া মানুষের উপাকরী।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আমলকী: আমলকী এর বৈজ্ঞানিক নাম Phyllanthus emblica) সংস্কৃত ভাষায় এর নাম 'আমলক'। ইংরেজি নাম amla বা Indian gooseberry. এশিয়ায় এ ফল বেশি দেখা যায়। আমলকী গাছ উচ্চতায় ৮ থেকে ১৮ মিটার। ফল হালকা সবুজ বা হলুদ ও গোলাকৃতি। ব্যাস ১/২ ইঞ্চির কম বেশি হয়। এ গাছ ৪/৫ বছর বয়সে ফল দেয়। আমলকীর ভেষজ গুণ রয়েছে অনেক। ফল ও পাতা দুটিই ওষুদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমলকীতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। এটি ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, প্রদাহ এবং কিডনি-রোগ ও রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে পারে। এছাড়া পেটের পীড়া, সর্দি, কাশি ও রক্তহীনতাসহ নানা রোগে এটি খুবই উপকারী।

কদবেল: বৈজ্ঞানিক নাম Feronia Limonia Swingle, এটি Rutaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, ইংরেজিতে বলা হয় Elephant Apple Monkey fruit. বাংলাদেশে বাউকদবেল-১ ও বারিকদবেল-১

নামের দুটি জাতের দেখা মিলে। বারিকদবেল-১ প্রচুর ফল ধরে। ফল গোলাকৃতি। পাকা ফল সবুজাভ বাদামি বর্ণের। ফলের শাঁস গাঢ় বাদামি ও মধ্যম রসালো, স্বাদ টক-মিষ্টি। এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও স্বল্প পরিমাণে লৌহ, ভিটামিন বি১, বি২ ও ভিটামিন সি রয়েছে। কদবেল যকৃত ও হৃদপিণ্ডের বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে। বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়ালে ক্ষত স্থানে ফলের শাঁস এবং খোসার গুঁড়ার প্রলেপ দিলে ভালো ফল মিলে। কচি পাতার রস দুধ ও মিসরির সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে শিশুদের পিত্তরোগ ও পেটের পীড়া নিরাময় হয়। ■

বিস্কুটের বিনিময়ে ফল

ফাহমিদা জাহান মহুয়া

খেয়ে বহু রোগের উপকার পেয়েছে বলেই লোকমুখে এটা 'আশ্চর্য ফল' নামে পরিচিতি পেয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে আফ্রিকার কঙ্গোয় ছিলেন কবীর হোসেন। কঙ্গোতে তিনি ননী ফলের ভালো একটি জাতের সন্ধান পান। দুই প্যাকেট বিস্কুটের বিনিময়ে কঙ্গোর এক ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি ৫টি ননী ফল সংগ্রহ করেন। শান্তি মিশনে কর্তব্য পালন শেষে দেশে ফিরে এসে যশোর সদর উপজেলার ছাতিয়ানতলা এলাকায় নিজের বাড়িতে ওই ফলের বীজ থেকে চারা তৈরি করেন।

ননী ফলের বৈজ্ঞানিক নাম 'গ্রেভিওলা'। ক্রান্তীয় অঞ্চল তথা ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিকভাবেই গুল্মজাতীয় এ গাছটির একটি বুনো জাত জন্মায়। ননী গাছের শেকড়, বাকল, পাতা, ফল প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে সর্দি-কাশি, লিভারের সমস্যা, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ননী ফলের রস ব্যবহার করা হয়। তবে আধুনিক গবেষণায় এই ফলের নানা গুণের কথা বেরিয়ে আসায় তা মানুষের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। ননী ফলে ক্যানসার ফাইটিং নিউট্রিয়েন্ট ও টিউমার ফাইটিং উপাদান রয়েছে। বিশেষ করে ক্যানসারের ক্ষেত্রে এটি ভালো ফল দিচ্ছে বলে গবেষকরা জানাচ্ছেন। ননী ফলের রস রক্ত পরিষ্কার করে ও শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। এর রস অ্যান্টি ফাঙ্গাস ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গুণ থাকায় পেটের সমস্যা, চর্মরোগ, চুলকানি, খুশকি কমাতে সাহায্য করে। সারা বছরই এতে ফল ধরে। এই ফলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৩, বি-১২, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফসফরাসসহ নানা উপাদান থাকে। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রঙিন ফলে সমৃদ্ধ শীতকাল

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ষড়ঋতুর পঞ্চম মাস শীতকাল পৌষ ও মাঘ মিলে হয়। শীতকাল মানেই বাজার ভর্তি ফলমূল। এই সময়ের ফলের স্বাদ ও পুষ্টি থাকে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি। শীতের মৌসুমে বাজারে প্রচুর পমিাণে পাওয়া যায় বিভিন্ন জাতের ও দামের ফল। তো চলো বন্ধুরা আমরা জেনে নেই শীতকালের কিছু জনপ্রিয় ফল এবং এদের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে।

কুল বা বরই: শীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল হচ্ছে বরই বা কুল। ইংরেজিতে একে ডাকা হয় Jujube বা Chinese Date নামে। কুল নানান রকমের হয়ে থাকে। যেমন- নারকেল কুল, আপেল কুল, বাউকুল প্রভৃতি। শীতকালীন এ ফলটি বেশ উপকারী। খাবার হজমের জন্য এই ফল বেশ ভালো। এটি ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ। ফ্লু, হাঁপানি, কোলন ক্যানসার ও বাতের ব্যথা সারাতে বরই বেশ উপকারী। বরইয়ে ভিটামিন এ, সি; ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামসহ আছে আরো নানা উপাদান। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সব ধরনের মাটিতে কুল জন্মে।

জলপাই: শীতঋতুর জনপ্রিয় একটি টকফল জলপাই। ইংরেজিতে বলা হয় Olive । জলপাইয়ের পাতা ও ফল দুটোই উপকারী। জলপাইয়ের রস থেকে তৈরি হয় তেল, যার অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ ফলে রয়েছে ভিটামিন এ ও ই। উচ্চরক্তচাপ, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য ও কোলন ক্যানসার দূর করতে জলপাই খুবই কার্যকর। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতেও জলপাই অনন্য।

সফেদা: শীতকালীন আর একটি ফল হলো সফেদা। ইংরেজিতে সফেদাকে Sapodilla বলা হয়। আমাদের দেশে আগে এ ফলটি তেমন একটা পরিচিত ছিল না। কিন্তু এখন এ ফলটি প্রিয় একটি ফলের তালিকায় চলে এসেছে এর পুষ্টিগুণের কারণে। অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টি উপাদানে ভরপুর খুবই নরম আর তুলতুলে ফল সফেদা। সফেদা চোখের জন্য খুবই উপকারী। ক্যানসার প্রতিরোধক, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দূরীকরণ, কিডনি সুরক্ষায় ও হেলদি ত্বকের জন্য, কোলেস্টরেল ও ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে এ ফল যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, বি কমপ্লেক্স, পটাসিয়াম, আয়রন ও ফাইবার।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বসন্তের সুস্বাদু ফল

আল ওয়াসিয়া শাহীদ

আতা: বসন্তকালের একটি পরিচিত ফল। আতাকে শরিফা বা নোনা ফল নামেও ডাকা হয়। এর ইংরেজি নাম Custard Apple। এতে রয়েছে নানান গুণ। শুধু স্বাদের কারণেই নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও এ ফলটি দারুণ উপকারী। ভিটামিন সি এর মতো নানা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে এতে। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি দূর, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো ও স্মৃতিশক্তি ভালো রাখতে আতা খাওয়া যায়। আতায় রয়েছে ভিটামিন, মিনারেল শর্করা, ভিটামিন 'বি৬', পটাশিয়াম ও আয়রন। এ ফল ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও হৃদরোগ এবং ক্যানসার প্রতিরোধক।

তেঁতুল: যার নাম শুনলেই জিভে আসে জল, তা হলো তেঁতুল টক ফল। পাকা তেঁতুল অবশ্য টক মিষ্টি হয়ে থাকে। তেঁতুলের ইংরেজি হলো Tamarind. তেঁতুল বসন্তের ফল হলেও শীত, গ্রীষ্ম বর্ষাকালেও পাওয়া যায়। এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার অ্যাসিড, চিনি, ভিটামিন বি। তেঁতুলে আয়রনের পরিমাণ সব ফলের চেয়ে ৫-২০ গুণ বেশি। তেঁতুল খেলে উচ্চ রক্তচাপ তাৎক্ষণিকভাবে উপশম হয়। তেঁতুল হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, কোলন ক্যানসার প্রতিরোধ করে, দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে, ওজন কমায়, লিভার সুস্থ রাখে, সর্দি-কাশি দূর করে। এর উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না।

তৈকর: বসন্তকালীন আরেকটি ফলের নাম তৈকর। যাকে ইংরেজিতে বলে Taikor. কী বন্ধুরা, নামটি তোমাদের কাছে অপরিচিত লাগছে? তৈকর ফলটি হলো একটি অপ্রচলিত ও প্রাচীন ফল। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তৈকরের চাষ হয়। এটি মূল্যবান পুষ্টি ও ঔষধিগুণে সমৃদ্ধ। প্রচুর ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, জিংক এবং আয়রন সমৃদ্ধ ফল এটি। এ উপকারী ফলটি মানুষের নানান রোগ দূর করার পাশপাশি মুখের রুচি বৃদ্ধি করে। এ ফল থেকে আচার, জ্যাম, জ্যালি তৈরি করা যায়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বেল: বেল একটি পুষ্টিকর এবং উপকারী ফল। ইংরেজিতে 'Woodapple' বলা হয় বেলকে। কাঁচা ও পাকা দুই অবস্থায়ই সমান উপকারী এ ফল। পাকা বেলের শরবত সুস্বাদু হয়। বেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস পটাশিয়ামের মতো মূল্যবান পুষ্টি উপাদান। দীর্ঘদিনের আমশয়ের সমস্যা, বদহজম দূর, হজম শক্তি বাড়ানোতে বেল অত্যন্ত উপকারী। শীতকালে বেল গাছের পাতা ঝরে পড়ে আবার বসন্তে আসে নতুন পাতা। বেল নিয়মিত খেলে কোলন ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে কমে যায়।■

বারোমাসি ফল

দ্বীন ইসলাম

পেয়ারা: শীতকালে বাজারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় পেয়ারা। পেয়ারাকে ইংরেজিতে Guava বলা হয়। স্বাদ, পুষ্টিগুণ ও সুস্বাস্থ্যের বিবেচনায় পেয়ারা খেলে প্রচুর লাভ হয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পেয়ারা রাখা যেতে পারে। এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি ও লাইকোপেন যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকার। পেয়ারার বিশেষ পাঁচটি গুণের মধ্যে রয়েছে এটি ডায়াবেটিসের জন্য খুব উপকারী, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, চোখের জন্য ভালো, পেটের জন্য উপকারী, ক্যানসার প্রতিরোধী। পেয়ারাতে আরো পাওয়া যায় ভিটামিন এ এবং বি কমপ্লেক্স, বিটা ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম ফসফরাস পটাশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড ও নিকোট্রিন অ্যাসিড।

কলা: জনপ্রিয় ফল কলা। অধিকাংশ প্রজাতির উৎপত্তি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায়। কলা Musaceae পরিবারের একটি উদ্ভিদ। এ পরিবারে প্রায় ৫০টি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত । বাংলাদেশে এর প্রায় ১৯টি জাত রয়েছে । পার্বত্য এলাকায় বাংলা কলা, বন কলা, মামা কলা ইত্যাদি নামে বুনো জাত দেখা যায়। প্রতিনিয়ত কলার জাতের সংখ্যা বাড়ছে। কলা পাকলে হলুদ হয়। বাংলাদেশে কলা চাষের সুবিধা হলো সারা বছর উঁচু জমিতে চাষ করা যায়। কলা নানা গুণের ফল। এর রয়েছে অধিক পুষ্টিগুণ । আছে আমিষ, ভিটামিন এবং খনিজ। কলা ক্যালরির একটি ভালো উৎস। একটি বড়ো জাতের কলা খেলে ১০০ ক্যালরির বেশি শক্তি পাওয়া যায়। কলাতে রয়েছে শর্করা, যা হজমে সাহায্য করে। কলায় থাকা আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং রক্তপ্রবাহ নিশ্চিতে কলা দারুণ কাজ করে। একটি কলায় প্রায় ৫০০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। যা স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।

পেঁপে: এটি এমন একটি ফল কাঁচা-পাকা দু'ভাবেই খাওয়া যায়। কাঁচা অবস্থায় সবজি এবং পাকলে ফল হিসেবে খাওয়া হয়। রয়েছে অঞ্চলভিত্তিক নানা নাম। বৈজ্ঞানিক নাম Carica papaya),এটি Caricaceae পরিবারের সদস্য। প্রায় সারা বছরেই ফুল ও ফল হয়। কাঁচা ফল সবুজ, পাকা ফল হলুদ বা পীত বর্ণের। এটি পথ্য হিসেবেও ব্যবহার হয়। পেঁপে বাংলাদেশ, ভারত, আমেরিকা, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্রই সবজি এবং ফলের জন্য এটি চাষ করা হয়। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে হজমকারী এনজাইম প্যাপাইন যা মানুষের পাকস্থলীতে আমিষ হজমে সাহায্য করে। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন আছে। পাকা পেঁপে কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূর করে।■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রইল বাকি পাঁচ

শাহীন আলম

ডুমুর: বৈজ্ঞানিক নাম: Ficus মোরাসিয়া গোত্রভূক্ত নরম ও মিষ্টি জাতীয় ফল ডুমুর। ফলের আবরণ ভাগ খুবই পাতলা এবং অভ্যন্তরে অনেক ছোটো ছোটো বীজ রয়েছে। এই ফল শুকনো ও পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়। উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এ গাছ জন্মে। ডুমুর কয়েক প্রজাতির হয়। বাংলাদেশে সচরাচর যে ডুমুর পাওয়া যায় তার ফল ছোটো। অনেক এলাকায় এই ডুমুর দিয়ে তরকারি রান্না করে খাওয়া হয়। ডুমুরের পাতা শিরিশ কাগজের মতো খসখসে। এর ফল কাণ্ডের গায়ে থোকায় থোকায় জন্মে।ধর্মগ্রন্থ কুরআনে 'ত্বীন' (আঞ্জির) নামে একটি অনুচ্ছেদ বা সূরা রয়েছে। সেখানে এই ফলকে আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত বলা হয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে, ক্ষুধার্ত যিশু একটি ডুমুর (আঞ্জির) গাছ দেখলেন কিন্তু সেখানে কোনো ফল ছিল না, তাই তিনি গাছকে অভিশাপ দিলেন। বৌদ্ধ ধর্মেও এই গাছ পবিত্র। গৌতম বুদ্ধ যে বোধি বৃক্ষতলে মোক্ষ লাভ করেন তা ছিল একটা ডুমুর জাতীয় গাছ।

নারিকেল: নারিকেল, নারকোল, নারকেল বা ডাবের বৈজ্ঞানিক নাম Cocos nucifera। পাম গাছের পরিবারের (আরেকেসি) সদস্য ও কোকোস গণের একমাত্র জীবিত প্রজাতি। উপকূলীয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে নারকেল বেশি জন্মে। অন্যান্য ফল থেকে আলাদা। নারকেলের এন্ডোস্পার্মে প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছ তরল থাকে। যার নাম নারকেল জল বা নারকেল রস। বীজের ভিতরের মাংস ও দুধ থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত তেল ; শক্ত খোল থেকে কয়লা, এবং ছোবড়া থেকে কোকোপিট তৈরি হয়। নারিকেল শাঁসের পুষ্টিগুণও অনেক বেশি। নারিকেলে আছে ক্যালরি, স্নেহ পদার্থ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কার্বোহাইড্রেট ও আমিষ। এছাড়াও ভিটামিন সি, ক্যালোসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি-৬ ও বি-১২ রয়েছে। নারকেল দাঁত ও হাড় ভালো রাখে, হজম সহায়ক। লিভারের অসুখে বেশ ভালো কাজ দেয় নারিকেলের দুধ। নারকেল যখন কচি অবস্থায় থাকে তখন তাকে ডাব বলে। ডাবের পানিতে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আছে। ১ কাপ ডাবের পানিতে যা খনিজ পদার্থ আছে, তা অনেক স্পোর্টস ড্রিংকের চাইতেও বেশি। একটি ডাবে একটি কলার চাইতে বেশি পটাশিয়াম থাকে। বাংলাদেশের ডাবের পানি বেশ মিষ্টি হয়, আর একটু হালকা নোনতা স্বাদ থাকে। যেসব দেশে স্যালাইন পাওয়া যায় না, সেখানে ডাবের পানিকে অনেক সময় স্যালাইন হিসেবে ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কমলা: শীতের ফলের রাজা বলা হয় কমলাকে। কমলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি'। এছাড়া রয়েছে ভিটামিনি 'এ' ভিটামিন 'ডি' কমপ্লেক্স, ফাইবার ও মিনারেল। যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। কমলালেবুকে ক্যানসার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

প্রতিরোধক বলা হয়। এটি হজমশক্তি বাড়ায়, সর্দি-কাশি সাড়ায়, মানসিক অবসাদ দূর করে। রক্তশূন্যতা ও জিভের ঘা সাড়াতে বেশ কার্যকারী।

তরমুজ : তরমুজে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা স্ট্রেস কমিয়ে দেয়। এছাড়া প্রোস্টেট ক্যানসার, কোলন ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যানসার ও স্তন ক্যানসারে ঝুঁকি কমায়। তরমুজে প্রচুর পানি থাকে, তাই গরমের সময় শরীরের পানিশূন্যতা দূর করে। শরীরকে সুস্থ ও সতেজ করে তোলে। এতে থাকা ক্যারোটিনয়েড চোখ ভালো রাখতে সহায়তা করে।

খেজুর : তাল জাতীয় শাখাবিহীন বৃক্ষ খেজুর। মরু এলাকার ফল হলেও ছেলেবেলার অনেকেরই প্রিয় ফল দেশি খেজুর। এটি ফ্রুকটোজ এবং গ্লাইসেমিক সমৃদ্ধ। রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়। শক্তির ভালো উৎস এ ফল। তাই খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তিভাব দূর হয়। এছাড়া আছে প্রচুর ভিটামিন বি, ক্যালরি, প্রোটিন, ক্যালশিয়াম ও ফাইবার।■

বিলুপ্তপ্রায় কিছু ফল | আব্দুল বাশার

বেতফল: বেত্তুন, বেথুন, বেথুল, বেতগুলা, বেত্তুইন ইত্যাদি নামে ডাকা হয় বেতফলকে। এই ফল গোলাকার বা একটু লম্বাটে গোলাকার, ছোটো ও কষযুক্ত টকমিষ্টি। এর খোসা শক্ত হলেও ভেতরটা নরম। বীজ শক্ত। কাঁচা ফল সবুজ ও পাকলে সবুজাভ ঘিয়ে বা সাদা রঙের হয়। এটি থোকায় থোকায় ফলে। অপ্রচলিত ফল হলেও অনেকের কাছে খুবই প্রিয়।

আমঝুপ: এটি অপ্রচলিত একটি গাছ ও ফল। এলাকা ভিত্তিক নাম ভিন্ন ভিন্ন। আমঝুম, নিনজিল ও কাউয়াঠুটে, বুনিজাম, বুতিজাম নামে ইত্যাদি নামে পরিচিত। ফলগুলো কাঁচা অবস্থায় সবুজ, আধপাকার সময় কমলা আর পেকে গেলে কালচে লাল রঙের হয়। বাহারি রঙের আমঝুম ফল, হলুদ, কমলা ও কালো রঙের থোকায় থোকায় ঝুলে থাকে। স্বাদে কিছুটা বুনো গন্ধযুক্ত মিষ্টি হয়।রাস্তার ধারে, ঝোপঝাড়,বনেবাদাড়ে জন্মায় এই গাছ। ছোটো ছেলেমেয়েদের কাছে খুব প্রিয় ফল। পাকা ফল পেলে গাছ সাবাড় করে দেয় পাখি।

চুকাই: চুকাই বা চুকুর (Hibiscus sabdariffa) একপ্রকার উপগুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের ফল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে ফলটি

পরিচিত। চুকুর, চুকুরি, চুপুরি, চুকোর, চুপড়, চুকা, চুক্কি, চুই, মেস্তা, খিইরুপ ইত্যাদি। ফলটি টক স্বাদযুক্ত; র গাঢ় লাল। এটি অপ্রচলিত ফলের বৃতি এর ভক্ষ্য অংশ, যা খুবই পাতলা এবং পরিমাণে অল্প; গর্ভাশয় বড়ো এবং ছোটো ছোটো হুলযুক্ত। ভক্ষ্য অংশটি গর্ভাশয়কে ঘিরে থাকে। পরিপক্ব গর্ভাশয়ে অনেকগুলো বীজ থাকে। ফলটি পাকলে ফেটে যায়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এবং বীজ ছড়িয়ে যায়। টক স্বাদের কারণে জ্যাম, জেলি বা আচার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া টক বা খাট্টা রান্না করেও খাওয়া হয়। চুকাই অনেক দেশে সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

কেওড়া ফল: কেওড়া গাছের আসল নাম সোন্নেরাতিয়া আপিতালা (Sonneratia apetala)। সুন্দরবনের সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত গাছ এটি। মাঝারি আকৃতির গাছটি ঝোপড়া হয়ে থাকে। অধিক লবণযুক্ত মাটিতে এ গাছ ভালো জন্মে। এর পাতা জিওল গাছের পাতার মতো সরু ও লম্বাটে। একটি ফলে বীজের সংখ্যা ২৫-১২৫টি। ফল প্রায় গোলাকৃতির এবং ব্যাস ২-৩ মিলিমিটার।

কেওড়া ফলের আকৃতি ডুমুরের মতো। সবুজ রঙের ফলের ওপরের মাংসল অংশটুকু অম্ল স্বাদের। ভেতরে বেশ বড়ো বীচি। সবচেয়ে বেশি উপাদেয় খাদ্য হরিণ আর বানরের। তবে বহু বছর আগে থেকে মানুষ ও মাছের খাদ্য এটি। এ ফল রান্না করে খাওয়া যায়, অনেকে ডালে খেয়ে থাকেন। টক স্বাদযুক্ত হওয়ায় কাঁচা লবণ দিয়ে খাওয়া যায়, আচার হিসেবেও খেয়ে থাকেন এ দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ।

কাঠলিচু : একপ্রকার লিচু জাতীয় সুস্বাদু ফল কাঠলিচু। এটি লংগান বা আঁশফল নামেও পরিচিত। এর গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Dimocarpus longan, যা ক্রান্তীয় অঞ্চলের বৃক্ষ। এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার উদ্ভিদ। কাঠলিচু গাছ মধ্যম আকারের চিরসবুজ গাছ যা ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। কাঠলিচুর ফল ঝুলন্ত এবং আঙুরের মতো গুচ্ছাকার। বেলেমাটি এই গাছের জন্য ভালো। কাঠলিচু এবং লিচু গাছের ফল ধরার সময় একই। এ ফলে প্রচুর শর্করা, ভিটামিন সি এবং খনিজ উপাদান আছে। কাঠলিচুর শুকনো শাঁস পাকস্থলীর প্রদাহে, অনিদ্রা দূর করতে এবং বিষের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতা এলার্জি, ক্যানসার, ডায়াবেটিস ও কার্ডিওভাসকুলার রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়।■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফল খাবার সময়-অসময়

মো. জামাল উদ্দিন

ছোট্ট বন্ধুরা, ফল খেলে কী হয় জানো? ফল খেলে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। কোনো রোগ সহজে আক্রমণ করতে পারে না। ফলে শরীর সুস্থ থাকে এবং মনও ভালো থাকে। শরীর ও মন ভালো থাকলে লেখাপড়া করতে, খেলাধুলা করতে খুব ভালো লাগে। আর লেখাপড়ায় মনোযোগী হলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা যায়।

ফল খাওয়ার সঠিক সময়

ফলের সরল শর্করা ভালোভাবে শোষণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। দুটি খাবারের মধ্যবর্তী সময় হলো ফল খাবার উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময় হজম পদ্ধতি ফলের মধ্যে থাকা শর্করা ভাঙতে পারে দ্রুত। যে কারণে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করা সহজ হয়।

হালকা খাবার হিসেবে

ক্ষুধা মেটাতে চটজলদি খাবার হতে পারে ফল। আর স্ন্যাকস হিসেবে ফল স্বাস্থ্য ভালো রাখবে ও ওজন কমাতে সাহায্য করবে।

খেলাধুলার আগে ও পরে

খেলাধুলার আগে ফল খেলে শরীরে সঙ্গে সঙ্গে কর্ম জোগাবে। আবার খেলাধুলার পর ক্লান্ত শরীরকে চাঙা করতে ফলের চাইতে ভালো খাবার আর হতে পারে না। ফলে ক্যালরি কম। খনিজ ও আঁশ বেশি যা খেলাধুলার কারণে হারানো কর্মশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য অনন্য।

যে সময় ফল খাওয়া ঠিক নয়

ঘুমানোর আগের সময়টা ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুমের সমস্যা হতে পারে। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

অন্যান্য খাবারের পরপরই

ফল আর অন্যান্য খাবারের মাঝখানে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুষ্টি পুরোপুরি শোষিত হবে না।

অন্যান্য খাবারের সঙ্গে

অন্য খাবারের সাথে মিশিয়ে ফল খেলে তা হজম পদ্ধতিকে ধীর করে দেয়। অর্থাৎ ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির ফার্মেন্টেশন-এর দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরো ধীরে হজম হয়। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

হারিয়ে যাওয়া ফল

ডুমুর

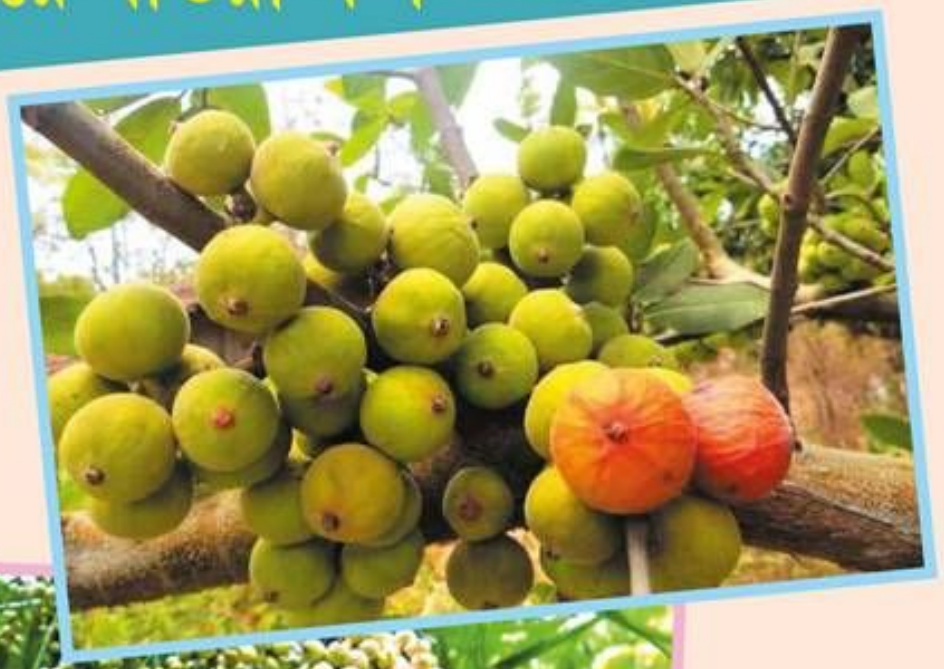

বেত ফল

পানকি চুনকি

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ডেউয়া

কাউ ফল

অরবরই

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ক বি তা গু চ্ছ

মধুমাসের ফল

কবির কাঞ্চন

গাছে গাছে কাঁচাপাকা ঝুলে থাকে আম,
মধুমাসে চোখে ভাসে কালো কালো জাম।
গাছে গাছে কাঁচাপাকা লিচু ঝুলে ঐ
মধুমাসে কচিকাঁচা করে যে হইচই।

গাছে গাছে কাঁচাপাকা কত ফল ফলে
মধুমাসে ছেলে-বুড়োর ফলে মন গলে।
গাছে গাছে কাঁচাপাকা ঝুলে কচি তাল
মধুমাসে সাদা শাঁসে ভরে যায় গাল।

গাছে গাছে লালচে-সাদা জামরুল ঝুলে ঐ
আনারস আর আতা ফলের গন্ধে পাগল হই।
সবুজ পাতার আড়ালে যে পেয়ারা হাসে
আমলকীতে ভিটামিন সি পাই মধুমাসে।

নিশিকালে পাকা খেজুর গাছ থেকে ঝরে
খোকাখুকু কুড়িয়ে নেয় হই-হুল্লোড় করে।
গাছে গাছে কাঁচাপাকা কাঁঠাল যে ঝুলে
মধুমাসে গাঁয়ে ছুটি সবকিছু ভুলে।

মধুমাসে মধুর হাঁড়ি

খান মাহবুবুর রহমান বাদল

বছর ভরে স্বপ্ন দেখি
গায়ে আম-কাঁঠালের গন্ধ মাখি।
জামের রসে কখন মুখ হবে রঙিন,
না পেলে আবার মনটা হবে মলিন
পাড়ায় পাড়ায় দল বেঁধে হব এক সঙ্গিন।
ঝড়ের দিনে চুপটি করে ঘাপটি মেরে বসি
কখনো একটি-দুটি আম, লিচু ভরবে মোর থলি,
অনেক ভোরে পাল্লা দিয়ে উঠে
দৌড়ে গিয়ে তালের গন্ধে তাল যে ধরা পড়ে।
পাতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে চাঁদের মতো হাসে
দুই-একটা পেয়ারা হলেই মনটা যায় ভরে।
মধুমাসে মধুর হাঁড়ি
সব ফলেদের ছড়াছড়ি
হরহামেশা চিন্তা শুধু
ফলের রাজ্যে ডুবেই থাকি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফল

বেণীমাধব সরকার

আমাদের এ দেশটা ফলে ফলে ভরা,
রকমারি ফল কত স্বাদে মিঠা-কড়া ।
জ্যৈষ্ঠ যে মধুমাস মধু ফল গাছে
তাই দেখে শিশুগণ আনন্দে নাচে।
ল্যাংড়া-আম্রপালি-হাড়িভাঙ্গা আম
খেলে বুঝি ভুলবে না কেউ তার নাম ।
থোকায় থোকায় ঝুলে গাছ ভরা লিচু
ভারে বুঝি ডালপালা হয়ে যায় নিচু ।
জাম, জামরুল ফল ফলে এই মাসে
শিশু-যুবা-বৃদ্ধেরা খায় উল্লাসে ।
কাঁঠাল জাতীয় ফল কোষে কোষে মধু
শ্বশুর-শাশুড়ি খায় , খায় নববধূ।
তাল, নারিকেল, ডাব উঁচু গাছে ফলে
পাকলে তা ঝপ করে পড়ে গাছ তলে ।
কলা, কামরাঙা, পেঁপে, ডালিম, আতা
এত নামে ভরে যায় কবিতার খাতা।
আমলকী, হরিতকি, বহেড়ার মাঝে
ওষুধির গুণ কত বলা যায় না যে!
বরই, তেঁতুল দেখে জিভে আসে পানি
ভিটামিন আছে তাতে সকলেই জানি।
ফল খেলে বল বাড়ে, কথা নয় মিছে ,
করোনাও ভয় পেয়ে ফিরে যায় পিছে ।

হরেক ফল

আহনাফ হোসেন

নানান জাতের নানান ফল
আছে আমাদের দেশে
এগুলো নিয়মিত খেলে পরে
শরীরে বল আসে।
সব বয়েসি সবার জন্য
সুস্থ থাকতে হলে
দেশি ফলের নেই তুলনা
সব জ্ঞানী-গুণীরা বলে।

৭ম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আম ছড়া

আসমা আক্তার

ফলটা সবার চেনা
থোকায় থোকায় ধরে ম্যালা
পাকা ফল সুবাস বিলায়
পথের ধারে ঝোপের টিলায়।
সে ফলের রাজা আম
অমূল্য তার নাম
স্বাদ যায় না ভুলা
মনে দেয় যে দোলা।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ভাষা-দাদু

ফলের গল্প

তারিক মনজুর

প্রস্তাবটা বিনুই দিলো। বলল, 'একটা ফল-উৎসব করলে দারুণ হয়!'

নেহা একটু দ্বিধা নিয়ে বলল, 'বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়েছে। আম-জাম-কাঁঠালের দিন ফুরিয়েছে। এখন ফল-উৎসব?'

পিলটু অবশ্য বিনুর প্রস্তাবেই সায় দিলো। বলল, 'আম-জাম-কাঁঠালের দিন ফুরিয়েছে, তাতে কী? বাজারে এখন পেয়ারা, আমড়া, আমলকি, আনারস, বাতাবিলেবু, কামরাঙা এগুলো পাওয়া যাবে।'

পিলটুর মুখে একসাথে অনেকগুলো ফলের নাম শুনে নেহা আর আপত্তি করল না। বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। ফল-উৎসব হোক। তবে সেখানে কিন্তু ভাষা-দাদুকেও আমন্ত্রণ জানাতে হবে।'

ভাষা-দাদুর ব্যাপারে কারোরই আপত্তি থাকার কথা নয়। সবাই খুশি হয়ে সায় দিলো। সিদ্ধান্ত হলো শাফিদের ফল বাগানে সবাই মিলে পরশুদিন সকাল দশটার সময় বসবে। মাঝখানের একদিন সবার প্রস্তুতির সময়। কে কোন ফল নিয়ে আসবে, ঠিক করে দিলো বিনু। একটা বড়ো কাগজে 'ফল-উৎসব' লিখে আনার দায়িত্ব নিল নেহা।

উৎসবের সময় ঠিক করা ছিল দশটা। কিন্তু শাফিদের ফল বাগানে এর আগেই সবাই হাজির হলো। বিনুর চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। কারণ, তার দেওয়া প্রস্তাব সফল হতে চলেছে। কিন্তু এখনও যে ভাষা-দাদু এলেন না!

একটু পরে দেখা গেল ভাষা-দাদু হাতে লাল রঙের পাকা গাব নিয়ে বাগানের দিকে আসছেন। দু-একজন সামনে গেল তাঁকে এগিয়ে আনার জন্য। ভাষা-দাদু আয়োজন দেখে মুগ্ধ হলেন। কয়েকটা পাটি বিছানো হয়েছে গাছের ছায়ায়। সেখানে ঝুড়িতে আর থালায় ফল রাখা হয়েছে। ফল ধোয়ার জন্য জগে করে পানিও রাখা রয়েছে। দাদুর বসার জন্য একটা চেয়ারও আছে। বিনু বলল, 'দাদু, আজকে তুমি প্রধান অতিথি।' তারপর চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'এই তোমার প্রধান অতিথির আসন।'

দাদু চেয়ারে বসার আগে বিনুর হাতে গাব তুলে দিলেন। নেহার ভাই নাবি প্রশ্ন করল, 'দাদু, এটা কী ফল?'

নাবি বাদে অবশ্য সবাই জানত এটা গাব। গাব গাছে ভূত থাকে, এটা ওরা জানে। তাই দু-একজন কানে কানে কী যেন বলল। বিনু সাহস করে বলল, 'দাদু, গাব গাছে কি ভূত থাকে? এই ফল কি খাওয়া যাবে না?'

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ভাষা-দাদু হাসলেন। বললেন, 'এই ফলে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে। আর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সর্দি, জ্বর, কফ, কাশি থেকে শরীরকে রক্ষা করে।'

গাব নিয়ে ভীতি দূর করে দাদু ফল-উৎসবের উদ্‌বোধন করলেন। এর আগে পিলটু বিভিন্ন রকম ফলের উপকারিতা সম্পর্কে পাঁচ মিনিটের একটা লেখা পড়ল। পিলটুর পরে ভাষা-দাদু উদ্‌বোধনী বক্তব্য দিলেন। তিনি বললেন, 'এসব ফলের বাইরেও আরও অনেক রকম ফল আছে। সেগুলো অবশ্য আজকের আলোচনার বিষয় নয়। সেগুলো ভাষার ব্যাপার।'

এরপর ফল ধুয়ে একে একে ফল খাওয়া শুরু করল সবাই। সব কাজে সবাই সবাইকে সহযোগিতা করতে লাগল। ফল খাওয়া শুরু হতে নেহা প্রশ্ন করল, 'দাদু, তুমি উদ্‌বোধনী বক্তব্যে বলছিলে, আরও অনেক রকম ফল আছে। সেসব ফল সম্পর্কে জানতে চাই।'

ভাষা-দাদু হাসলেন। বললেন, 'এই যেমন ধরো পরীক্ষার ফল। অবশ্য এটাকে তোমরা ফলাফল বলো।'

নেহা বলল, 'ফল আর অফল মিলে ফলাফল হয়েছে। তাই না, দাদু?'

দাদু 'হ্যাঁ' বলে তাঁর কথা চালিয়ে যেতে থাকলেন, 'আবার ধরো আছে অঙ্কের ফল। অঙ্কের ফল বলতে সমাধান বোঝায়। তারপরে ধরো শাস্তি বোঝাতে ব্যবহার করা হয় পাপের ফল। কাজের পরিণাম বোঝাতে বলা হয় কর্মফল। উপকার বোঝাতে ব্যবহার করা হয় ওষুধের ফল। মীমাংসা বোঝাতে বলা হয় খেলার ফল। আবার লাভ অর্থেও ফল শব্দের প্রয়োগ আছে।'

শাফি দাদুর হাতে একটা ছোটো পেয়ারা তুলে দিলো। বলল, এটা আমাদের বাগানের পেয়ারা। দাদু কামড় দিয়ে দেখলেন, ভিতরটা নরম এবং গোলাপি রঙের। তিনি খুব আয়েশ করে চিবিয়ে পেয়ারার পুরোটা খেয়ে ফেললেন। তারপর আবার শুরু করলেন–'ফলের আগে বি বসিয়ে হয় বিফল, স বসিয়ে হয় সফল, কু বসিয়ে হয় কুফল, সু বসিয়ে হয় সুফল, নিঃ বসিয়ে হয় নিষ্ফল, প্রতি বসিয়ে হয় প্রতিফল।'

সবাই মনোযোগ দিয়ে দাদুর কথা শুনছিল। আর নিজেদের মধ্যে ফল ভাগ করে খাচ্ছিল। দাদু এবার এক টুকরো আনারস তুলে নিলেন। বললেন, 'আনারস ভাইরাস প্রতিরোধী ফল। এ সময়ে সবারই বেশি বেশি আনারস খাওয়া উচিত।' এই বলে তিনি আবার শব্দের খেলায় গেলেন। বলতে লাগলেন, 'ফলের পরে অন বসিয়ে হয় ফলন, আনো বসিয়ে হয় ফলানো, অন্ত বসিয়ে হয় ফলন্ত, প্রসূ বসিয়ে হয় ফলপ্রসূ, প্রাপ্তি বসিয়ে হয় ফলপ্রাপ্তি,বান বসিয়ে হয় ফলবান, ভোগ বসিয়ে হয় ফলভোগ, মূল বসিয়ে হয় ফলমূল,লাভ বসিয়ে হয় ফললাভ, শ্রুতি বসিয়ে হয় ফলশ্রুতি, আহার বসিয়ে হয় ফলাহার, দায়ক বসিয়ে হয় ফলদায়ক, দ বসিয়ে হয় ফলদ...'

ভাষা-দাদুর কথার মাঝখানে শাফি বলল, 'দাদু, আমাদের বাগানে অনেক ফলজ গাছ আছে। তাহলে, ফলের সাথে জ বসিয়ে ফলজ হবে না?'

দাদু বললেন, 'বনজ, পঙ্কজ এসব শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে অনেকে বলেন ফলজ। এটাকে শব্দের সাদৃশ্য বা মিল বলে। একটা শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে আরেকটা শব্দ তৈরি হতে পারে। তবে ব্যাকরণ বলে, ফলজ শব্দটা ভুল। কারণ, জ ব্যবহার করা হয় জন্ম অর্থে। যেমন, বনে জন্মে যে তাকে বলে বনজ, পঙ্কে জন্মে যে তাকে বলে পঙ্কজ।'

'তাহলে আমরা ফলজ না বলে কী বলব?' একসঙ্গে কয়েকজন জানতে চায়।

দাদু হাসেন। বলেন– 'ব্যাকরণ মেনে বলতে চাইলে ফলদ বলতে হবে। ফল দেয় যে, তাকে বলে ফলদ। এখানে দ যোগ হয় দেওয়া অর্থে। একইভাবে জল দেয় যে, তাকে বলে জলদ। ...জলদ মানে কী, জানো তো? জলদ মানে মেঘ। কারণ, মেঘই তো জল দেয়।'

দাদুর কথা শেষ হতেই আকাশে মেঘের গুড়গুড় ডাক শোনা গেল। পিলটু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বৃষ্টি আসবে।'

অবশ্য এখন বৃষ্টি আসলেও সমস্যা নেই। কারণ, ফল-উৎসব শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। ইদানীংকার বৃষ্টিতে প্রচুর বজ্রপাত হয়। তাই দাদু বললেন, 'আমাদেরও বাইরে থাকার সুযোগ নেই। এক্ষুনি যার যার ঘরে চলে যেতে হবে।'■

শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বর্ষা

জাওয়াদুল ইসলাম ভুঁইয়া

মায়া ভরা কোন নির্ঝর তুমি
অস্থায়ী কোন পাখি
পালকেতে তারি সলিলের সারি
বর্ষণে দেহ মাখি।

নভ দ্বারে তব আগমনি বাণী
পবনের বেগে শান
অরণ্য- মাতা তৃষ্ণায় গায়
আহুতির যত গান।

অবশেষে কত সাধনার ফল
আসিল বরিষ ধারা
তরুলতা বনে জাগে শিহরণে
প্রতিটি পাতার শিরা।

আকাশে মেঘের চাদর বিছিয়ে
আঁধারের ছবি আঁকি
ছবির পাতায় ঝলকায় শুধু
কোন সে উজল বাতি!

হৃদয় আমার থেকো নাকো ভার
নাচো উচ্ছ্বাস-দোলে
মুক্ত আকাশ থেকে ঝরে পড়ো
মুক্ত ভূমির কোলে।

নবম শ্রেণি, হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর

বর্ষা এলে

ফারুক হাসান

বর্ষা এলে পদ্ম ফোটে ভোরের আঙিনায়,
পুব আকাশে রঙের ছোঁয়া দেখবি কে কে আয়
কী অপরূপ বর্ষা দিনের মিষ্টি সকালবেলা,
সবুজ ঘাসে দোয়েল, টিয়ে, ঘাস ফড়িঙের খেলা
দিঘির পাড়ে বাজনা বাজে তাকুর কুর কুর তাক্,
সারাটি গ্রাম উঠত মেতে, দিচ্ছে নতুন ডাক।
বর্ষা ভেজা টইটম্বুর স্বপ্নে জেগে রই,
এমনি দিনে খেতে মজা মুড়কি ভাজা খই।
বর্ষা ভোরে খোকাখুকির ভাঙে সুখের ঘুম,
মা-মণি দেয় তাদের মুখে সোহাগ মাখা চুম।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

যেই দেশে

খোরশেদ আলম নয়ন

যেই দেশেতে শাপলা ফোটে
ঝিলের জলে হেসে
রাজকুমারী স্বপ্ন দেখায়
দেশকে ভালোবেসে।

সুনীল সাগর ঝরনা-নদী
যেই দেশে বয় নিরবধি-

যেই দেশেতে দোয়েল ডাকে
মিষ্টি মধুর সুরে-
সেই দেশেরই ছবি আঁকা
আমার হৃদয় জুড়ে।

লক্ষ বীরের রক্তে কেনা
যে দেশেরই মাটি
কোথায় পাবে স্বদেশ এমন
সোনার চেয়ে খাঁটি।

ইচ্ছেগুলো

সাঈদ তপু

ছোট্টবেলায় ইচ্ছেরা সব
আকাশ নীলে মিশে
হারিয়ে যেত দূর অজানায়
বাধন আবার কীসে?
জীবন ঘুড়ি উড়ত শুধু
ইচ্ছেঘুড়ির ডানায়
মনটা ছিল পাখির মতো
পূর্ণ কানায় কানায়।
এখন আমার ইচ্ছেগুলো
পাখির ঝরা পালক
চাইলেও আর যায় না হওয়া
দস্যিপনা বালক।

আমাদের গ্রাম

রকিবুল হাসান (রিজন)

আমার গ্রামটি সবার সেরা
সবুজ-শ্যামল দিয়ে ঘেরা।
গ্রামের নামটি বিবিরচর
এখানে বইছে শিক্ষার ঝড়।
গ্রামে আছে কেজি, প্রাইমারি, মাদ্রাসা
তাই তো আমাদের অনেক প্রত্যাশা।
গ্রামের বুকে ছোটো নদী
বাতাস বইছে নিরবধি।
শাপলা, শালুকের বসেছে মেলা
সেথায় ছোটোরা করে খেলা।
আমার গ্রামের সুনাম বেশ
এটাই সোনার বাংলাদেশ।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস ধারাবাহিক

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর: তৃতীয় পর্ব]

নকল রাজাকার, আসল গুপ্তচর

সন্ধ্যের একটু আগে রাজাকার ছেলেটি দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। তার সাথে আরেকটি ছেলে– ওরা দুজনই আমার বয়েসি। ওরা ঘরে ঢুকেই খিল এঁটে দেয়। আমাদের পরিচিত রাজাকার ছেলেটি আস্তে আস্তে বলে– আমার নাম সাইদ, আর এ আমার বন্ধু রাশিদুল। আমার একটা পরিচয়– আমি এই ক্যাম্পের কমান্ডার রাজাকার ছানাউল্লার ছেলে সাইদ রাজাকার; আরেক পরিচয়– আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তবে এখনো যুদ্ধের মাঠে যাইনি। এখানেই প্রাকটিস করছি। ধলগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জমির ভাইয়ের সাথে আমার যোগাযোগ আছে। তার বাহিনীর গুপ্তচরই তো আমি। আমার এই বন্ধুও তাই। আরো চারজন আছে এই ক্যাম্পে। তারা হলো নাইট গার্ড– রাতে অস্ত্র হাতে ক্যাম্পের চার কোনায় চারজনের ডিউটি। আমিই তাদের রিক্রুট করেছি এবং পোস্টিং দিয়েছি। নাইট গার্ডের ডিউটি খুব কষ্টকর বলে এদের এই দায়িত্ব দেওয়ায় অন্যরা বরং খুশি। আমি রাজাকার কমান্ডার ছানাউল্লার ছেলে; এখানে আমার কথার উপর কথা বলে কে! তবে একটা ব্যাপারে আমি খুবই লজ্জিত, তা হলো– ওই নিমকহারাম স্বাধীনতার শত্রু ছানাউল্লা আমার জন্মদাতা বাবা; আবার গর্বিত এজন্য যে, শয়তান রাজাকারের সন্তান হয়েও আমি দেশের জন্য কাজ করতে পারছি।

সাইদের লম্বা বক্তৃতায় আমরা একেবারে হতবাক– এ কি সম্ভব? স্বপ্ন দেখছি না তো? আমরা কেউ কিছু বলার আগে সাইদ আবার মুখ খোলে। শোনো, তোমাদের কপাল ভালো। কমান্ডার-ডেপুটি কমান্ডার আর তাদের কয়েকজন পাণ্ডা বিকেলে হঠাৎ শহরে গেছে, আর্মি অফিসাররা ডেকেছে নাকি। কাল ছোটো দুপুরের আগে ফিরবে না (ছোটো দুপুর মানে বেলা এগারোটা/সাড়ে এগারোটা, তা তো তোমরা জানোই)। আর কমান্ডার না থাকলে আমিই ক্যাম্পের 'কমান্ডার', মানে কমান্ডারের ছেলে বলে কথা! সুতরাং বুঝতেই পারছ, আজই সুযোগ– আজ রাতেই ঘটনা একটা ঘটাতে হবে...

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ঘটনা! কী ঘটনা? আমি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করি। এবার রাশিদুল বলে– দারুণ ঘটনা ঘটবে ভায়েরা। আমরা ছয়টা ছেলে রয়েছি এই ক্যাম্পে, যারা ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধা– মানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। এখনো তেমন বড়ো ঘটনা আমরা ঘটাতে পারিনি, আজ ঘটাবো– আজ রাতেই....

কী ঘটাবা, খোলাসা করে বলো ভাই। আমার তো পেট ফুলে উঠছে জানতে না পেরে। আমি আবার বলি। তখন সাইদ বলে– শোনো, আমরা আগে থেকে ছয়জন আছি রাজাকার হয়ে। এখন তোমরা এই সাতজন, এই হলো তেরোজন। বাহ! বেশ বড়ো একটা দলই হবে, কী বলো?

তাতে কী? আমরা সাতজন তো রাজাকার ক্যাম্পে বন্দি, আর তোমরা ছয়জন এই ক্যাম্পের মধ্যেই আছো। আরও কত অস্ত্রধারী রাজাকার রয়েছে ক্যাম্পে। তাদের সাথে প্রকাশ্য ফাইটে যাওয়ার কথা ভাবছ নাকি? তা কী সম্ভব? কীভাবে যাবা? আর সেই ঘটনাই বা কীভাবে ঘটাবা? আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি সাইদ-রাশিদুল দুজনকেই।

সাইদ কিছুক্ষণ মাথা চুলকায়, কী যেন ভাবে। রাশিদুলও। মিনিটখানেক মাথা চুলকে মানে চুলের মধ্যে আঙুলের বিলিকেটে বেশ জোরের সাথেই বলে– হ্যাঁ, আজ রাতেই। রাতে গার্ডের দায়িত্বে থাকবে আমাদের ছেলেরাই। আর কমান্ডার-ডেপুটি কমান্ডার জেলা সদরে গেছে বলে অন্যদের মধ্যেও ঢিলা ঢিলা ভাব থাকবে– এটাই আমার ধারণা, বিশ্বাসও বলতে পারো। এখানে রাজাকার বাহিনী গঠন হয়েছে মাত্র পনেরো-বিশদিন আগে। তাই রাজাকারের সংখ্যা যেমন এখনো বেশি হয়নি, ক্যাম্পের গোছগাছও ভালোভাবে হয়নি। তাছাড়া ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধারা এখনো আক্রমণ করেনি বলে ওদের বিশ্বাস। ভয়েই মুক্তিযোদ্ধারা কমান্ডার ছানাউল্লার সাথে লাগতে আসেনি; কোনোদিন আসবে কিনা তারও ঠিক নেই। আর একটা গোপন কথা, সহকারী কমান্ডারও আজ রাতে ক্যাম্পে থাকবে না। তার বাড়ি পাশের মহিরন গ্রামে। আজ রাতে সে বাড়িতেই থাকবে। আমাকে বলেছে এদিকে একটু খেয়াল রাখতে আর কথাটা গোপন রাখতে। তাহলে ভায়েরা, এতগুলো ফাঁকফোকর পেয়েও আমরা কিছু ঘটাতে পারব না?

রাশিদুল আঙুল গুনে গুনে বলে– এক নম্বর ফাঁক: কমান্ডার ডেপুটি কমান্ডার আর কয়েকজন হোমরাচোমরা ক্যাম্পে নেই, শহরে গেছে; দুই নম্বর ফাঁক: নাইট গার্ডের দায়িত্বে থাকবে আমাদেরই ছেলেরা; তিন নম্বর ফাঁক: কমান্ডার-ডেপুটি কমান্ডার ক্যাম্পে না থাকায় সবার মধ্যে একটু গা-ছাড়া ভাব থাকবে; চার নম্বর ফাঁক: মুক্তিযোদ্ধারা এখনো এই ক্যাম্পে আক্রমণ না করায় রাজাকারদের বিশ্বাস– কমান্ডার সানাউল্লার ভয়ে তারা আক্রমণ করছে না এবং ভবিষ্যতেও আক্রমণ নাও করতে পারে; পাঁচ নম্বর ফাঁক: এখানে রাজাকারের সংখ্যা মোটামুটি কমই, ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন বড়োজোর; ছয় নম্বর ফাঁক: সহকারী কমান্ডারও রাতে ক্যাম্পে থাকবে না; আর সাত নম্বর বা সর্বশেষ ফাঁক হলো: খোদ রাজাকার কমান্ডারের ছেলেই মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে। তাহলে সব মিলে কী দাঁড়ালো, বাবু ভাই?

রাশিদুলের আচমকা প্রশ্নে আমি একটু ভড়কে যাই। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলি– এই ফাঁকগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারলেই কেল্লাফতে। এসব ফাঁক হলো ওদের দুর্বল জায়গা। দুর্বল জায়গায় আঘাত করলেই ওরা কুপোকাত হবে।

এবার মুখ খোলে সাইদ–আর একটা কথা: সত্য আর ন্যায়ের পক্ষের তেরোজন মুক্তিযোদ্ধা দেশবিরোধী রাজাকারদের তিনশ জনের চেয়েও শক্তিমান– এ কথাটা মনে রাখবা। এখন থেকে ঠিক পাঁচ ঘণ্টা পরে– রাত বারোটা এক মিনিটে আমরা এখান থেকে পালাবো, মানে-'এদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আমরা চলিয়া যাইব আমাদের আসল জায়গায়।' সাইদের শেষ কথাটা যাত্রার সংলাপের মতো শোনায়।

কীভাবে পালাবো? তুমি কি ভালোভাবে ভেবেচিন্তে একথা বলছ, সাইদ? আমি একটু কড়াভাবে জিজ্ঞেস করি। তখন সাইদ বলে– তাহলে শোনো: আমি সব ভেবেচিন্তেই বলেছি। আজকের মতো এমন চমৎকার সুযোগ আর নাও পেতে পারি। গার্ড চারজনকে অলরেডি বলে দিয়েছি আমরা আজ রাতে পালাবো,

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

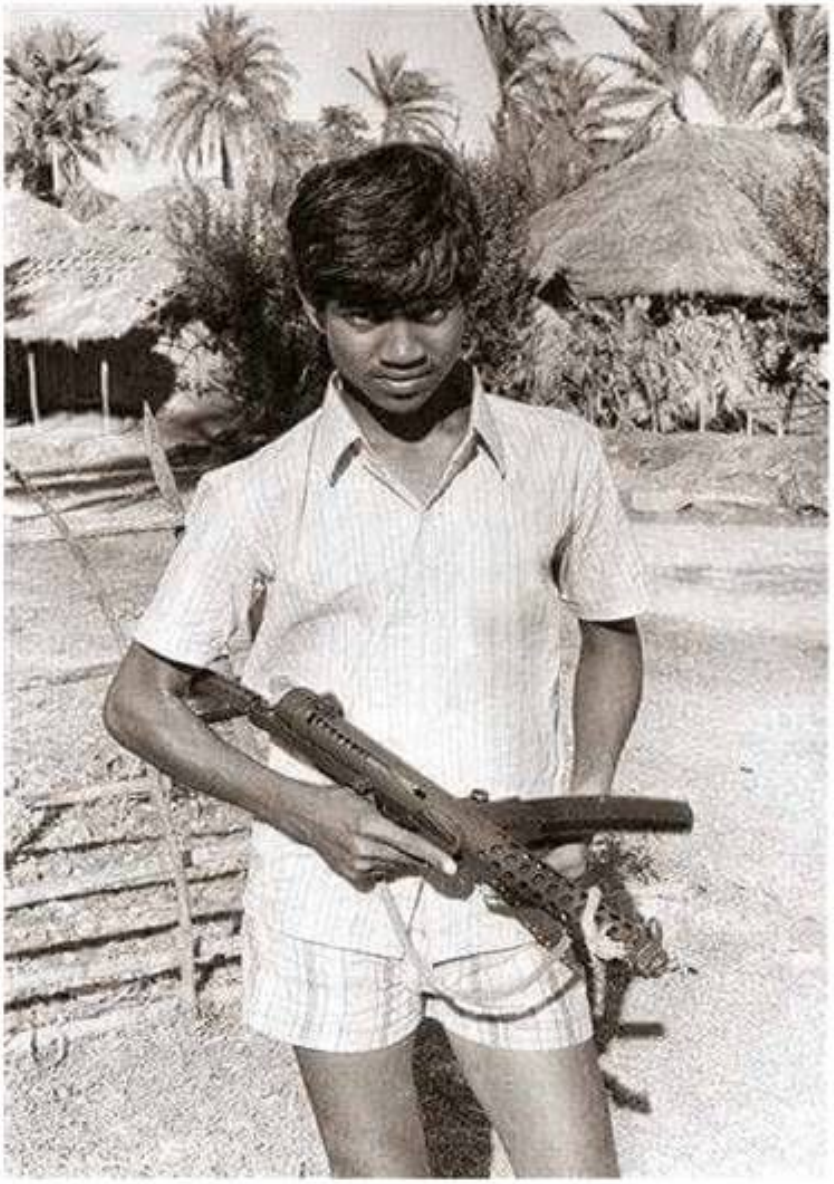

আমি চিনি। শালারা ভীতুর ডিম একেকটা– চামচিকেরও অধম। কমান্ডার- ডেপুটি কমান্ডার আর হোমরাচোমরারা ক্যাম্পে থাকলে ভারি সাহসী বীর; আর তারা না থাকলে কুনো ব্যাঙ, তেলাপোকাও বলতে পারো। কোনো রকমে রাতের খাওয়া খেয়েই ঘরে খিল দেবে। ভাবটা এমন: জবরদস্ত চার অস্ত্রধারী রাজাকার প্রহরী রয়েছে ক্যাম্প-সীমানার চার কোনায়। সুতরাং আর কীসের চিন্তা, কীসের ভয়? কিন্তু চার প্রহরী যে আমাদের লোক, তা কী ওরা জানে? তাহলেই বলো: গভীর রাতে আমরা যদি টুক করে পাশের নদীর পাড়ের ধঞ্চেবনে ঢুকে পড়ি এবং দোহাকুলার আমবাগানে একসাথে হই, তা কী খুব কঠিন হবে? তখন সেখান থেকে ভুলবেড়ের মাঠ পার হয়ে কবিরভিটের পাশ দিয়ে ধলগ্রামে পৌঁছানোও কী খুব কঠিন হবে? বলো? কথায় আছে: বেড়ায় যদি গাছ খায় তো বেড়া ঠেকাবে কে! এখানেও হয়েছে তাই– ক্যাম্পের প্রহরীরাই যখন পাহারা ছেড়ে পালাবে, তখন পাহারা দেখে কে! কেউ না। বন্দি পাখিগুলো মুক্ত হয়ে উড়ে যাবে রাজাকারের খাঁচা ভেঙে। হা...হা...হা...

তবে সময়টা এখনো বলিনি। তো ভায়েরা, এই যে পালাবো বললাম না? এই পালানোর মধ্যে কোনো লজ্জা নেই। ঠিক পালানো নয়– বলতে পারো কৌশলগত পিছুহটা। এই ক্যাম্পের সব খুঁটিনাটি আমার জানা। এখান থেকে গিয়ে সব রিপোর্ট করব কমান্ডার জমির ভাইকে। সেই মোতাবেক সুযোগ বুঝে এখানে আক্রমণ হবে। সুতরাং এই পালানোর মধ্যে বহুত উপকার আছে।

আমি আবার বলি– পালানোটা কী সহজ হবে? অন্যরা দেখবে না?

সাইদ হেসে বলে– অন্যরা!! হাসালে বন্ধু। ওদের

খানিকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসে সাইদ। তারপর বলে– তোমরা এখানে আপাতত 'বন্দি' থাকো। তবে সম্পূর্ণ রেডি থাকবা। সময় মতোই দরজা খুলে তোমাদের বের করে নেওয়া হবে। এখন একটু রেস্ট নাও।

এ পর্যন্ত বলে সাইদ আর রাশিদুল বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। দরজার তালা লাগানোর শব্দ শোনা গেল অন্য সময়ের মতোই। তো দাদুরা, আজ এ পর্যন্ত থাকবে, না আরও শুনবা? এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে– তোমাদের আবার ইশকুলের লেখাপড়া

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আছে। আমার মনে হয় আজ এ পর্যন্তই থাক। কাল তো ছুটিবার মানে শুক্রবার। কাল না হয় সকালে এবং বিকেলে দুই সেশন হবে, কী বলো? তারপর... তারপর... সময় ও সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝেই চলবে এই আসর, কেমন?

দাদুর কথায় যুক্তি আছে– ইশকুলের জন্যও তো প্রস্তুতি নিতে হবে। তবু আমি দাদুকে অনুরোধ করি– ডিয়ার দাদু, আর একটুখানি। শুধু, তোমরা রাতে কীভাবে পালালে ওটুকু বলেই আজকের সেশন শেষ করো। এই সামান্যটুকুই তো মোস্ট থ্রিলিং; এটুকু না শুনতে পারলে ক্লাসের পড়ায় মনই বসবে না। প্লিজ দাদু! অবশ্য তার পরের গল্প তোমার কথামতো সময়-সুযোগমতোই বলো। অমার সাথে সাথে অন্যরাও একজোটে মধু মেশানো-আবদার মাখানো গলায় বলে– প্লিজ দাদু... প্লি-ইজ...

এবার দাদু হেসে বলেন– ওকে... ওকে দাদুরা। তোমাদের আগ্রহ দেখে আমারও ভারি ভালো লাগছে। মনে চায় সারারাত তোমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সত্য গল্প বলি। কিন্তু তা তো করা যাবে না। তোমাদের ক্লাসের পড়া আছে। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে এদিকে খেয়াল না রাখলে কী চলে! তো, অল্প সময়ে ঝটপট শেষ করি।

সাইদের কথামতো ঠিক সময়ে আমাদের ঘরের তালা খোলার শব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকল রাশিদুল। সে ফিসফিস করে বলে– এসো, কুইক! আমরা সাতজন তৈরিই ছিলাম। মুহূর্তে বাইরে আসি। রাশিদুল ফের ঘরের তালা লাগায়। তারপর চাবিটা ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে– এসো, ফলো মি। অন্যরাও বেরিয়ে গেছে।

আমি এই প্রথম অবাক হয়ে দেখলাম– ক্যাম্পে কোনো আলো জ্বলছে না। এদিকে অমাবস্যার রাত। ঘোর অন্ধকারে আশপাশের দালানগুলোকে ভূতুড়ে ছায়ার মতো মনে হচ্ছে। রাশিদুল ফিসফিস করে আবার বলে– লাইট জ্বলবে না। মেইন সুইচ ডিসকানেক্ট করা হয়েছে। কেউ যদি হঠাৎ ঘুম থেকে জাগেও, ভাববে– বিদ্যুৎ চলে গেছে। এমন অজ পাড়াগাঁর থানা সদরে বিদ্যুৎ থাকার চেয়ে যায়-ই বেশি। এই অন্ধকারই আমাদের বন্ধু। তোমরা আমার পিছু পিছু আসো।

আমরা সাতজন রাশিদুলের পিছু পিছু চলতে থাকি। সামান্য দূরে নদীর পাড়ের ধঞ্চেবন– সে এক পেল্লায় জঙ্গল। আমরা দু-মিনিটের মধ্যেই সেই ধঞ্চেবনে ঢুকে পড়ি। খানিকটা এগোতেই সাইদের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়: আর দেরি নয় এসো তাড়াতাড়ি– কুইক!

ধঞ্চেবন পার হয়ে দোহাকুলা বাজার মসজিদের উত্তর পাশটায় যেতে আমাদের প্রায় দশ মিনিট লেগে গেল। পথ বেশি না, কিন্তু ধঞ্চের গাছগুলো এত ঘন যে, দ্রুত এগোনো যাচ্ছিল না। যাহোক, আমরা দ্রুত রাস্তায় উঠে এলাম। রাস্তা এখনকার মতো পাকা ছিল না তখন– সম্পূর্ণ কাঁচা, মানে মাটির রাস্তা। দুপুরে বৃষ্টি হয়েছে বলে রাস্তায় বেশ কাদা। ঘন অন্ধকার বলে বেশি জোরে হাঁটা যাচ্ছে না। টর্চ বা কোনো ধরনের লাইট জ্বালাবার উপায় নেই। যদিও এই গভীর অমাবস্যার রাতে বাইরে কারো সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। তবু সাবধান থাকা ভালো– হঠাৎ রাশিদুল বলল।

আমরা দোহাকুলা পার হয়ে তালবাড়িয়া-চেঁচুয়াখোলা- ঠাকুরকাঠি হয়ে ভুলবেড়ে গ্রামে এসে পৌঁছি। গ্রামটি বিলের মধ্যে। এখানে কেবল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকদেরই বসবাস। হঠাৎ সাইদ বলে– এখন আর ভয় নেই। এখান থেকে ধলগ্রাম খুব দূরে নয়। এসো, আমরা একটু জিরিয়ে নিই।... এই যে বাড়িঘরগুলো দেখছ না, এখানকার প্রায় সব মানুষই ইন্ডিয়ায় চলে গেছে, বাকিরাও যাবে। অন্যান্য গ্রামের হিন্দুরা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষেরা কেউ দেশ ছাড়ছে; কেউ কেউ বিভিন্ন রিমোট এরিয়ায় পালিয়ে থাকছে। কিন্তু এভাবে আর কদ্দিন! দেশের মানুষদের হত্যা করে, তাদের অন্য দেশে তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে আর তাদের সহায়-সম্পত্তি লুটে নিয়ে কী স্বাধীনতা ঠেকানো যায়? বলো তো বাবু ভাই, যায়?

না, কখনোই ঠেকানো যায় না– যেমন আমাদের বন্দি করেও ঠেকানো যায়নি। তুমি রাজাকারের ছেলে হয়েও আমাদের মুক্ত করে এনেছ। আমরা এখন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছি। তোমার কোনো তুলনা নেই, ভাই। তুমি সত্যি মহান এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্যালুট তোমাকে...

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সাইদ আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে, তারপর বলে– এখনই প্রশংসা নয়, বাবু ভাই। আমাদের সামনে এখনো অনেক কাজ। অনেক বড়ো যুদ্ধ। হয় বাঁচব নয়তো শহিদ হবো। ঠিক আছে, চলো, আমরা আবার রওনা দিই।

রওনা দেওয়ার জন্য আমরা কেবল উঠেছি, অমনি সামান্য দূরে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কীসের যেন ছায়া দেখা যায়। কালো কুচকুচে কী যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমাদের চার প্রহরী-বন্ধুর কাছে চারটে রাইফেল। সাইদের পোটলায় একটা গ্রেনেড– কীভাবে যেন সরিয়েছে ক্যাম্পের অস্ত্র ঘর থেকে। অন্য আর সবার হাতে মোটা লাঠি। আমিই প্রথম দেখি জন্তুটাকে। তারপর ইঙ্গিতে সাইদকে দেখাই। এরপর ফিসফিস করে অন্যদেরও বলি। রাইফেলধারী একজন গুলি করার অনুমতি চায়। সাইদ বলে– না। তাতে বিপদ হতে পারে। রাইফেলের শব্দ শত্রুদের কানে যেতে পারে এবং এতে আমরা বিপদে পড়তে পারি। আমিও তাকে সমর্থন করি। আমি ভালোভাবে খেয়াল করে দেখি– ওটা একটা কালো কুকুর। ধীরপায়ে হেঁটে আসছে। বোধ হয় সারাদিন কিছুই খায়নি। ও আরেকটু এগুতেই ওর মুখ থেকে এক ধরনের মিনতিসূচক কুঁইকুঁই শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দের মধ্যে বাঁচার আকুতি বা খিদের জ্বালা থেকে মুক্তির আবেদন নেই; সে যেন ভিন্ন কিছু বলতে চায় আমাদের। আমরা সবাই তার দিকে এগিয়ে যাই, সবার ধারণা: ক্ষুধার জন্যই কুকুরটি অমন কুঁইকুঁই করছে। কুকুরটি কী মনে করে আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর ঘন ঘন কুঁইকুঁই করতে থাকে। আমার পোটলায় একটা বড়ো পাউরুটি ছিল বন্দিঘরে সাইদ–ই দিয়েছিল আমাকে, সেটি ওর সামনে দিতেই দ্রুত খাওয়া শুরু করে। অন্যদের যার কাছে যা ছিল, কুকুরটির সামনে দিল। কুকুরটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সব সাবাড় করে ফেলে। আমরা বুঝতে পারি এখন ওর পানি খাওয়া দরকার। আমাদের এক বন্ধুর পোটলায় একটা বাটি ছিল। পথে খাওয়ার জন্য আমরা যে এক ক্যান পানি এনেছিলাম দোহাকুলা বাজার-মসজিদের টিউবওয়েল থেকে, তা থেকে পরপর দু-বাটি পানি দেওয়া হলো কুকুরটিকে খেতে। এভাবে ওর জল পান বেশ ভালোই হলো মনে হয়। ও মুহূর্তে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালো এবং কুঁইকুঁই করে যেন বোঝাতে চাইল তোমরা আমার সাথে এসো– যুদ্ধ করবে– দেশের জন্য প্রয়োজনে জীবন দেবে। তারপর কী করল, জানো?

কী! আমরা একযোগে জিজ্ঞেস করি দাদুর কাছে। দাদু বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– সে-এক অদ্ভুত কাণ্ড। পশুপাখি-জন্তুজানোয়ারদের আমরা অনেক সময় অবলা, বুদ্ধিহীন ইতর প্রাণী বলে তুচ্ছজ্ঞান

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

করি। দূরছাই বলে তাড়িয়ে দিই কিংবা লাঠিপেটা করি। কিন্তু না, ওদেরও গভীর বুদ্ধি আর বিবেচনাশক্তি আছে, যার সাক্ষী আমি নিজে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম– কুকুরটি আমাদের আগে-আগে ধলগ্রামমুখী পথ ধরে জোরে হাঁটা শুরু করেছে; যেন সে-ই আমাদের কমান্ডার! যেন সে আগে থেকেই জানে আমরা কোন দিকে, কোথায় যাব। আমাদের অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। নিবিড় অন্ধকারের বন্ধুটি জোরকদমে মার্চ করে যেখানে গিয়ে থামল, সেটা ধলগ্রাম বাজারের মাইল দেড়েক দক্ষিণ দিকের একটি বিশাল ঘন আমবাগান। বাগানে ঢুকেই সে সামান্য শব্দ করে ডেকে ওঠে; যেন কাউকে আমাদের উপস্থিতির সংকেত দিলো। সেই সংকেত পেয়েই আমগাছের আড়াল থেকে রাইফেল-হাতে দুজন লোক বেরিয়ে এল। রাইফেল আমাদের দিকে তাক করা। সাইদ হাত উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি বলে– জমির ভাই, আমি সাইদ, আর এই বারোজন আমার বন্ধু; মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে এসেছে।

আর এ? এ তোমাদের বন্ধু না? এ মুক্তিযোদ্ধা না?– কুকুরটিকে দেখিয়ে জমির ভাই বলেন। তার কথায় সাইদ লজ্জিত হয়ে বলে– সরি জমির ভাই, সেও আমাদের বন্ধু– বলতে পারেন একেবারে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং মুক্তিযোদ্ধা...

তাকে তো আমিই পাঠিয়েছিলাম তোমাদের এসকট করে আনতে– সঠিক ঠিকনায় তোমাদের পথ দেখিয়ে আনতে। ওর নাম লায়ন, আমিই রেখেছি নামটা – হাসতে হাসতে বলেন জমির ভাই। তার কথা শুনে লায়নের সে কী খুশি! ঘন ঘন লেজ নাড়ায় আর আস্তে আস্তে কুঁইকুঁই শব্দ করে। তার দুচোখে যেন অফুরান আনন্দের দীপ্তি ঝিলিক খেলে।

জমির ভাই আবার বলেন– তোমরা শুনলে অবাক হবে– ওকে গেরিলা ট্রেনিং করানো হয়েছে। ও গ্রেনেডও ছুঁড়তে জানে। তবে ওকে ইনফরমার হিসেবেই বেশি কাজে লাগাই। তাছাড়া অন্ধকারে কোনো শত্রুকে আচমকা কামড়ে ঘায়েল করে দ্রুত নিরাপদে ফিরে আসায় ওর জুড়ি নেই। আশপাশের রাজাকার ক্যাম্পে ও বেশ কটি ঘায়েল অভিযান চালিয়েছে ঘোর অন্ধকারে, আচমকা। যাকে সামনে পেয়েছে, তাকেই আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করেছে। আমরা গেরিলা অপারেশনে গেলেও ওকে মাঝে মাঝে নিয়ে যাই। ওর হামলায় কেউ এখনো মারা না গেলেও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে অনেকে। এ যে জিন-ভূতের কাণ্ড তা রাজাকারেরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। এমনকি হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরাও কথাটা উড়িয়ে দিতে পারেনি।

আমি তখন বলি– মুক্তিযোদ্ধাদের যারা হেল্প করে, তারাও মুক্তিযোদ্ধা– যেমন এই কুকুরটি, তাই না জমির ভাই?।

আমার প্রশ্ন শুনে জমির ভাই বলেন– ঠিক তাই। এই যে গভীর ঘন আমবাগান, সে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে তার বুকে। আমরা রাতের অন্ধকারে এখান থেকে বেরিয়ে শত্রুদের ওপর গেরিলা হামলা চালাই গঙ্গারামপুর-খাটোর-সুইতলা-পানিঘাটা-ঘোষগাতি-মোহাম্মদপুরসহ আশপাশের অঞ্চলে; আবার ফিরে আসি এখানে। শত্রুরা এখনো আমাদের অবস্থান শনাক্ত করতে পারেনি। পলাশির আমবাগান নবাব সিরাজকে সাহায্য করতে পারেনি; কিন্তু ধলগ্রামের এই আমবাগান আমাদের বন্ধুর মতো আগলে রেখেছে পরম মমতায়।

তাই আমার বিবেচনায় এই বাগানের প্রতিটি আমগাছই একেকজন মুক্তিযোদ্ধা– নিশ্চল দাঁড়িয়ে-থাকা সজীব মুক্তিযোদ্ধা! তোমরা শুনে রাখো, শুধু সর্বস্তরের জনগণই নয়; বাংলার প্রকৃতি– তার নদীনালা, খালবিল, মাঠঘাট, জীবজন্তু, গাছগাছালি সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের সপক্ষে থেকে তাদের নানাভাবে সাহায্য করছে। কথাটার মধ্যে অলৌকিকতার আভাস থাকলেও এটাই সত্য বলে আমার বিশ্বাস; এবং এমন অবস্থায় আমাদের বিজয় অনিবার্য– এটিও আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

[চলবে]

শিশু সাহিত্যিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নতুন ফল- নতুন আশা

আরিফুর রহমান

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে বছরজুড়ে কোনো না কোনো ফল পাওয়া য়ায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখন মৌসুমি ফল সারা বছর পাওয়া য়ায়। সেই সাথে যোগ হয়েছে বিদেশি ফল । বিদেশি ফলের এসব জাত সবই থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। জানা যায়, এখন সারা বছর ২২ জাতের বিদেশি ফল নিয়মিত পাওয়া যায়। দেশের মাটিতেই এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা হচ্ছে মাল্টা, কমলা, থাই কুল, থাই পেঁপে, স্ট্রবেরি, মেলন, অ্যাভোকাডো, রামবুটান, সাওয়ার সপ বা টক আতা, আলুবোখারা, ম্যাঙ্গোস্টিন, ক্যানিস্টেল বা জামান ফল, প্যাশন ফ্রুট, পার্সিমন, অ্যাভোকাডো, কোকো, আঙুর, পিচ, চেরি, লংগান, সৌদি খেজুর, ব্রেডফ্রুট, শানতোল, রক মেলনসহ নানা রকম বিদেশি ফল। আরো এসেছে কাজুবাদামসহ অনেক বিদেশি ফল। এ ছাড়া এমন কিছু ফল, যা এ দেশে ছিল, কিন্তু সেগুলোর বেশ কিছু নতুন জাতের আগমন ঘটায়, সেসব ফল চাষে ও উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। থাই পেয়ারা এর অন্যতম উদাহরণ। থাইল্যান্ড থেকে পেয়ারার এ জাতগুলো আসায় এখন আমরা সারা বছরই সুস্বাদু পেয়ারা খেতে পারছি।

একইভাবে এসেছে প্রায় সারা বছর বা অ-মৌসুমে ধরা সুস্বাদু সুমিষ্ট আমের জাত কাটিমন, দুই-তিন কেজি ওজনের আম ব্রুনাই কিং, লাল টুকটুকে বাহারি আম আমেরিকার পালমার, হলদে রঙের কলার মতো লম্বা জাতের আম ব্যানানা ম্যাংগো, এমনকি দেশের মাটিতে সয়লাব হয়ে যাওয়া আম্রপালি,লাল কাঁঠাল, থাই জামরুল, মিষ্টি অরবরই, মিষ্টি তেঁতুল, মিষ্টি করমচা, মিষ্টি কামরাঙা, রঙিন শরিফা, ডোয়ার্ফ নারিকেল, অ-মৌসুমি তরমুজ ইত্যাদি। এসো জেনে নেই দেশের ফলের তালিকায় জায়গা করে নেওয়া বিদেশি কিছু ফল সম্পর্কে।

চেরিঃ সবুজ পাতার ফাঁকে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকে লাল টুকটুকে চেরি মূলত জাপানের ফল হলেও এটি আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়।দেখতে লোভনীয় আর স্বাদে অতুলনীয় চেরি ভরা অসাধারণ পুষ্টিগুণে। চেরিতে আছে ক্যালরি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফোলেট, ভিটামিন সি, ভিটামিন এ , ভিটামিন কে, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ কমাতে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধে দারুণ কার্যকর চেরি। এছাড়াও বাতের ব্যথা, মাথা ব্যথা ও মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে ও রক্তের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমিয়ে রক্ত চলাচলে সহায়তা করে।

ডেফলঃ এটি ডাম্বেল, ডেমগোলা (চাকমা ভাষায়) এবং আরুয়াক (গারো ভাষায়) নামে পরিচিত। ইংরেজিতে একে 'ফলস ম্যাংগোস্টিন', 'মাংকি ফ্রুট' 'এগ ফ্রুট' বা 'ইয়েলো ম্যাংগোস্টিন' নামে ডাকা হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম Garcinia xanthochymus যা Clusiaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। গাছটির আদি নিবাস মালয়েশিয়া। ফলটি মাঝারি আকারের আপেলের সমান, মসৃণ, অগ্রভাগ সূঁচালো এবং কিছুটা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বাঁকানো। কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং পাকলে গাঢ় হলুদ রঙের হয়। এই ফলের শাঁস সুগন্ধযুক্ত ও রসালো। ভেতরে এক বা একাধিক বীজ থাকে। স্বাদ টক-মিষ্টি।

স্ট্রবেরি: একসময় নির্দিষ্ট কিছু বাগানে সীমিত

পরিমাণে দেখা গেলেও বর্তমানে রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে স্ট্রবেরি। গাছের (Fragaria vesca) গড়ন থানকুনি গাছের মতো, লতা মাটিতে গড়ায়। ফল একক। পাকা ফলের রং উজ্জ্বল লাল, গা-অসমান, খাঁজকাটা, তাতে বীজ থাকে, স্বাদ টক-মিষ্টি। এ ফলে আছে ভিটামিন এ ও সি।

ড্রাগন : বাণিজ্যিকভাবে চাহিদা থাকায় দেশে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগন ফলের চাষ হচ্ছে। গাছ লতানো। সচরাচর চার রঙের ড্রাগন ফল দেখা যায় বাজারে লাল বাকল, লাল শাঁস; হলুদ বাকল, সাদা শাঁস; লাল বাকল, সাদা শাঁস; লাল বাকল, নীলচে লাল শাঁস। রঙের ভিন্নতা অনুযায়ী স্বাদের ক্ষেত্রেও তারতম্য লক্ষ

করা যায়। শাঁসের ভেতর ছোটো ছোটো অজস্র কালো রঙের বীজ থাকে। লাল রঙের ফল থেকে চমৎকার প্রাকৃতিক রং পাওয়া যায়। এই রং শরবত তৈরিতেও ব্যবহার হয়।

প্যাশন বা ট্যাং: বিভিন্ন নার্সারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে চাষ হচ্ছে প্যাশন। এই ফলের শরবত অত্যন্ত সুস্বাদু ও

পুষ্টিকর। প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন সি এতই বেশি যে প্যাশন ফলের এক-চতুর্থাংশ একজন মানুষের নিত্যদিনের ভিটামিন সির চাহিদা মেটাতে সক্ষম। গাছ (Passiflora edulis) লতানো, পাতা সবুজ, কিনারা গভীরভাবে খাঁজকাটা। ফল সুগোল, বড় সফেদা আকারের, খোসা শক্ত। পাকা-ফলের রং হলদেটে।

অ্যাভোকাডো: এখন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে

পাওয়া যায় এই ফল। অ্যাভোকাডোর (Persea americana) আদি নিবাস আমেরিকা। ফল পরিণত

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

হতে প্রায় সাত-আট মাস সময় লাগে। আকৃতিতে বেশ বড়ো-১ থেকে ২ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এ ফল সাধারণত সালাদের মিশেল হিসেবেই ব্যবহার হয়।

রামবুটান: পাতা ও ডালপালার বিন্যাস অনেকটা লিচুগাছের মতোই। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় এ ফল এখন দেশেই চাষ হচ্ছে। রামবুট মালয় ভাষার শব্দ,

এর অর্থ চুল। তাই কেউ কেউ একে হেয়ারি লিচু বলে থাকেন। এতে যথেষ্ট পরিমাণ ঔষধি গুণ আছে। কাঁচা অবস্থায় দেখতে ফলটি সবুজ আর পাকলে লাল গোলাপি রং ধারণ করে। খোসার গায়ে চুল বা কাঁটার মতো অংশ থাকে এবং কিছুটা কদম ফুলের মতো দেখায়। এটি লিচু পরিবারের ফল। উপরের অংশ ফেলে দিলে ভেতরের অংশ দেখতে ও খেতে লিচুর মতোই।

পার্সিমন: গাব পরিবারের এই ফল জাপানে খুব জনপ্রিয় এবং সেখানে কাকি (Diospyros kaki) নামে পরিচিত। ১৯৯৮ সালে জাপান থেকে নিয়ে আসা বীজগুলো রোপণ করা হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টারে। এখন

অনেকেই এই ফল চাষ করছে ফল আয়তাকার, কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকা রং হলুদ-সবুজে মেশানো। বীজযুক্ত শাঁস সুমিষ্ট।

এপ্রিকট: এপ্রিকট একটি ইউরোপিয়ান ফল। পরিবেশ অনুকূলে থাকায় আমাদের দেশেও এখন এটি সফলভাবে চাষাবাদ হচ্ছে। এপ্রিকট ইংরেজি নাম এর বাংলা অর্থ খুবানি। বহুগুণ সমৃদ্ধ এ ফল বিশেষত স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। এই ফলের মজার দিক হলো, এটি উপরের মজাদার অংশ খাওয়ার পর এর শক্ত আবরণের বীজটা ভাঙলে সুন্দর এক টুকরো বাদাম বের হয়ে আসে। অত্যন্ত সুস্বাদু। এপ্রিকটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘বি$_{২}$’ ভিটামিন ‘বি$_{৩}$’ ভিটামিন ‘এ’, ভিটামিন ‘সি’ প্রোটিন ও উপকারী ফ্যাট। এটি রক্তের হিমোগ্লোবিন বাড়ায় এবং রক্তশূন্যতা দূর করে। ■

খনার বচন

বারো মাসে বারো ফল
না খেলে যায় রসাতল

ফল খেয়ে জল খায়
জম বলে আয় আয়

কলা-রুয়ে না কেটো পাত
তাতে কাপড় তাতেই ভাত

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

শিশুর দুরন্তপনা সামলাতে করণীয়

সুলতানা বেগম

আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। এই শিশুরা একদিন বড়ো হয়ে দেশ ও জাতির কাণ্ডারি হবে। তারা ঘরের শোভা। হৈচৈ আর দুরন্তপনায় সব সময় মাতিয়ে রাখে। তাদের মনের নানা প্রশ্নের বাঁকে পড়তে হয় অভিভাবকদের। শিশুদের দুরন্তপনা সামলাতে অনেক বাবা-মাই হিমশিম খান। অনেকে আবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না। অভিভাবকদের শিশুদের প্রতি সহযোগী ও বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। যাতে তারা বিপথগামী না হয়। প্রতিটি শিশুর মধ্যে রয়েছে সুপ্ত প্রতিভা। আমাদের ধৈর্য আর সুন্দর আচরণ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে তাদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারে।

একটি শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার একমাত্র দায়িত্ব অভিভাবক ও রাষ্ট্রের। শিশুদের দুরন্তপনা থাকবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়। মাত্রাতিরিক্ত হলে সমস্যা হতে পারে। তাই শাসন প্রয়োজন, কিন্তু মারধর নয়। এ নিয়ে কিছু করণীয় তুলে ধরা হলো:

শিশুরা অনুকরণশীল। তারা যখন বুঝতে শিখে তখন বড়োদের অনুকরণ করতে থাকে। প্রকৃতিগতভাবে সন্তানের প্রথম শিক্ষক হচ্ছে বাবা-মা। পরে পরিবারের অন্য সদস্যরা। তাই শিশুদের কোনো শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজেদের সেই শিক্ষা পালন করতে হবে। কেননা বড়োদের দেখাদেখি ছোটোরাও সেসব আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শিশুরা যখন ধাপে ধাপে বড়ো হতে থাকবে তখন তাদের সিদ্ধান্ত তাদেরকেই নিতে দিতে হবে। জামা কাপড়, পছন্দসই খেলনা, পড়ার বিষয় যেন নিজেই বেছে নিতে পারে সে সুযোগ দিতে হবে। এতে তারা মানসিকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকবে।

শিশুদেরকে সময়ের কাজ সময় মতো করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যেমন: ঘুম থেকে ওঠা, পড়তে বসা, খাওয়া বা খেলাধুলার অভ্যাস করানো। সন্তানের প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন বাবা-মা। একথা মনে

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রেখেই সন্তানের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করে তাদের ভালো-মন্দ শেখায় উৎসাহিত করতে হবে।

প্রতি মা-বাবার উচিত সন্তানকে বোঝা। কারণ সব সন্তান এক রকম হয় না। সন্তানকে দুষ্টুমির খারাপ দিকগুলো বোঝাতে হবে, ভালোমন্দের বোধ রপ্ত করতে হবে। তবেই তারা দুষ্টুমি আর অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে পারবে। শাসনের ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতে হবে। দুষ্টুমি করলে শাসনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বকাঝকা ও মারধর করে নয়। আদর ও বোঝানোর মাধ্যমে তাদের সমাধান করতে হবে।

দুষ্টুমি আর দুরন্তপনা থেকে রক্ষা পেতে ছেলেবেলা থেকেই সন্তানদের শিক্ষামূলক ও মনীষীদের গল্প শোনাতে হবে। কারণ গল্প শুনতে অনেক বাচ্চাই পছন্দ করে, অনক জিজ্ঞাসাও থাকে। আর গল্প শোনার সময় কিছুক্ষণ হলেও স্থির থাকে। পাশাপাশি খেলাধুলায়ও শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে। এতে শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকবে।

শিশুদের চাহিদা এবং আবদারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তারা তাদের খেয়ালখুশি মতো কোনো কিছুর জন্য আবদার করতে পারে। চাওয়া মাত্র সব চাহিদা পূরণ না করে তাদের আদর করে বায়না মেটাতে হবে নিজেদের সাধ্যের মধ্যে। কোনো রকম প্রশ্রয় না দিয়ে চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করতে হবে। কারণ চাওয়া মাত্র পাওয়া গেলে বাচ্চারা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে।

শিশুদের সময় দিতে হবে। যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন প্রতিদিন অন্তত কিছুটা সময় তাদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। এতে তারা দারুণ উপভোগ করবে। এবং তাদের দুষ্টুমির পরিমাণও কমবে।

শিশুরা দুষ্টুমি করলে ঠান্ডা মাথায় বোঝাতে হবে। রাস্তায়, অন্য কারো বাড়িতে বা মেহমানদের সামনে তাদের বকা যাবে না। কারণ শিশুদেরও আত্মসম্মানবোধ আছে। এ রকম করলে অনেক সময় শিশুরা জেদি হয়ে যায়।

বাচ্চারা সব সময়ই কোমলমতি। এক ভুল বার বার করতেই পারে। তাই বলে ধৈর্য হারানো যাবে না। সুযোগ দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে ভুল বা অন্যায় সম্পর্কে যেন নিজের বোধ গড়ে ওঠে। ■

পরিধি ত্রিপুরা, কেজি-শ্রেণি, সেন্টঠ্রিজার স্কুল, রাঙামাটি

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বর্ষায় একদিন

মুহাম্মদ বিহাম

বর্ষাকাল আমার খুব ভালো লাগে। এ ঋতুতে প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি হয়। কখনো মুষলধারে, কখনো ইলশেগুঁড়ি। বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

একদিন দাদুর সাথে বাজারের ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে বাজারে গেলাম। তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা বাজারে ঢুকতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। থামার কোনো নাম নেই। দাদু আর আমি ছাতা নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

বাড়িতে আসার কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামল। তারপর বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখি পুকুর-খাল বিল-ডোবা সব ডুবে পানিতে ভরে গেছে। আম্মু ডেকে বললেন, পুকুরের কাছে যেও না। কারণ তুমি সাঁতার জানো না। তাই আমি আর পুকুরের কাছে গেলাম না। কিছুক্ষণ পর আবার কালো মেঘে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। আমি বারান্দায় বসে ছড়া কাটতে শুরু করলাম-

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে। লেবুর পাতা করমচা, যা বৃষ্টি ঝরে যা!'

৫ম শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

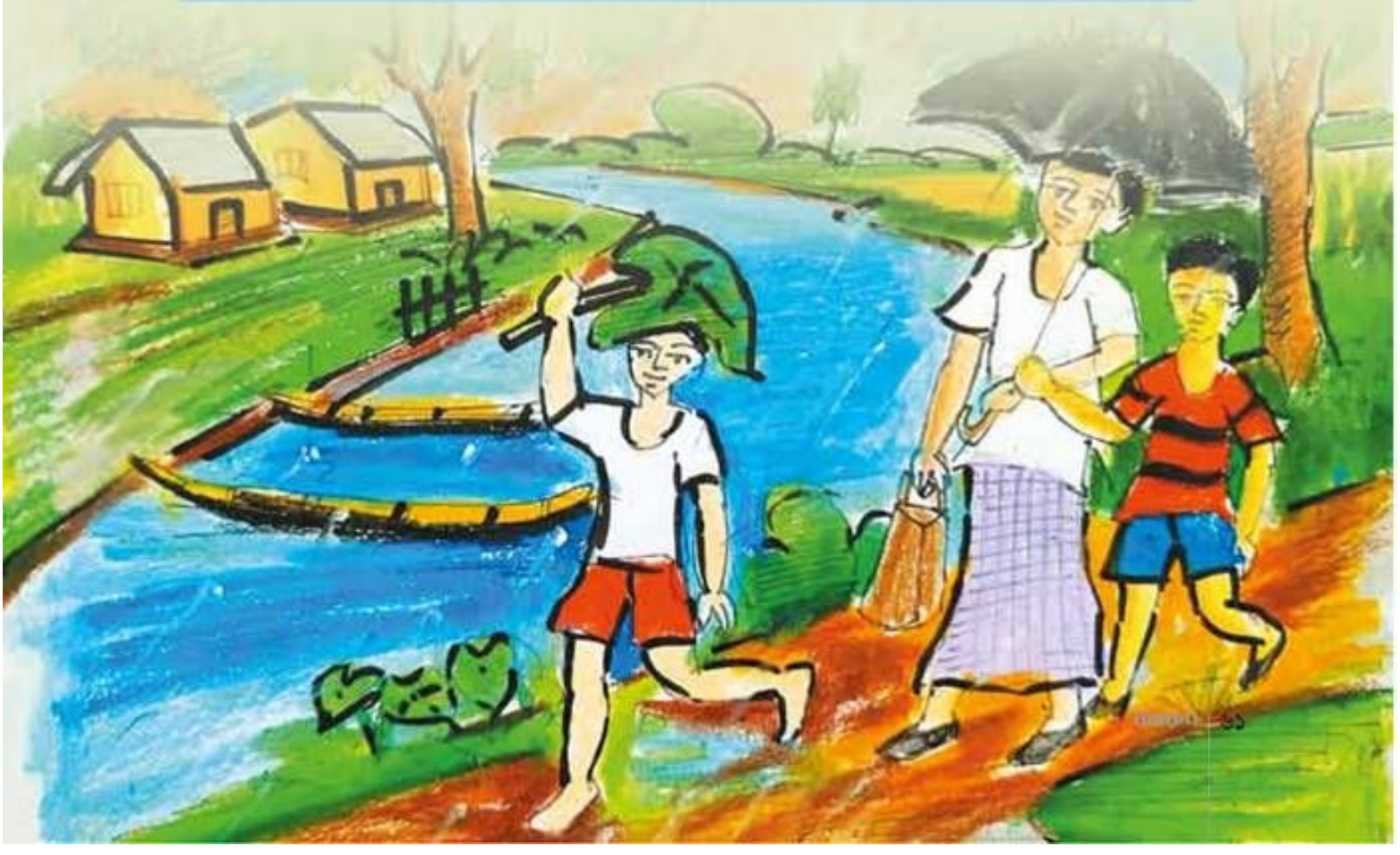

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

শিশুদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

মাহবুবা আক্তার

ডেঙ্গু এডিস মশাবাহিত একটি ভাইরাসজনিত জ্বর। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত শিশুদের জ্বর হলে অভিভাবকদের একটু বেশি সচেতন থাকতে হয়। ডেঙ্গু রোগ শিশুদের জন্য অনেক সময় জটিল হয়ে উঠতে পারে।

শিশুদের ডেঙ্গুর লক্ষণ অনেকটা বড়োদের মতোই হয়। জ্বর, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা, বমির ভাব কিংবা বমি, খাবারে অরুচি, পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া ইত্যাদি হলো ডেঙ্গুর লক্ষণ। সাধারণত মশা কামড়ানোর ৩ থেকে ১০ দিনের ভেতর রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এই সময় শিশুকে মশারির ভেতর রাখা উচিত। জ্বর ভালো হওয়ার পরও শিশুদের দশ দিন পর্যন্ত মশারির ভেতর রাখা উচিত, যাতে অন্যদের মধ্যে এই রোগ না ছড়ায়।

ডেঙ্গু হলে ঘন ঘন তরল খাবার দিতে হবে। পানি, লেবুর শরবত, ফলের রস, স্যালাইন, ডাবের পানি ইত্যাদি খেতে দেবেন। আপনার শিশু নিয়মিত প্রস্রাব করছে কিনা তা খেয়াল রাখবেন। ছয় ঘণ্টার ভেতর একবারও প্রস্রাব না করলে শিশুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। জ্বর হলে শিশুদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা বেশি হয় সেটা হলো, শিশুরা খেতে চায় না। পর্যাপ্ত খাবার না খেলে সেটাকে ডেঙ্গুর বিপদ চিহ্ন বা ওয়ার্নিং সাইন হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া পেট ফুলে গেলে, বমি হলে বা পাতলা পায়খানা হলেও সেটা ওয়ার্নিং সাইন হিসেবে গণ্য করা হয়। এই অবস্থায় শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা জরুরি।

জ্বরের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রায় প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ ও ঘন ঘন স্পঞ্জিং করা যেতে পারে। ৩-৫ দিন পর্যন্ত জ্বর থাকে। জ্বর চলে যাওয়ার পরই সাধারণত রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। শিশুদের প্রস্রাব কম হলে, হাত-পা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে, অজ্ঞান হয়ে গেলে অথবা শরীর নিস্তেজ হয়ে গেলে শিশুর শক সিনড্রোম হতে পারে। এ সময় চিকিৎসক বা হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে থাকা খুব জরুরি।

প্রতিরোধে করণীয়

- শিশুদের ফুল স্লিভ জামা-প্যান্ট পরিয়ে রাখতে হবে।
- দিন বা রাত যখনই শিশু ঘুমাক না কেন তাকে মশারির ভেতরে রাখতে হবে।
- মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য রিপেলেন্ট লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে। এতেও কিছুটা কাজ হয়।
- নিজেদের বাড়িঘর, কার্নিশ ও ছাদে আটকে থাকা স্থির পানি, যা এডিস মশার প্রজননের জন্য আদর্শ ক্ষেত্র, তা ধ্বংস করতে হবে।
- সপ্তাহে অন্তত একবার বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

কন্যা শিশু

জান্নাতে রোজী

সবচেয়ে কম বয়সি বেস্টসেলার লেখক রিতাজ

দুটি বেস্টসেলার উপন্যাস লিখে বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সি লেখক হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডসে নাম লিখিয়েছে রিতাজ আল হাজমি নামের বারো বছরের এক কিশোরী। তার লেখা প্রথম বই ইটালিক [ট্রেড্রজার অব দ্য লস্ট সি] বেস্টসেলার হয়। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৮ সালে। এরপর ২০১৯ সালে প্রকাশিত ইটালিক [পোর্টাল অব দ্য হিডেন ওয়ার্ল্ড] বেস্টসেলারের তকমা পায়।

আরবের মেয়ে রিতাজ আল হাজমি ছোটোবেলা থেকেই গল্প-উপন্যাস পড়তে ভালোবাসত। তবে তার পছন্দের তালিকায় সেরা হলো ফ্যান্টাসি গল্প। তার যে কয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোও ফ্যান্টাসি ঘরানার। তার লেখা অন্য আরেকটি বই হলো ইটালিক বিয়ন্ড দ্য ফিউচার ওয়ার্ল্ড (২০২০)।

রিতাজ মাত্র ৯ বছর বয়সেই প্রথম বইটি লেখার কাজ শেষ করেছিল। কিন্তু প্রকাশক আরো বিস্তারিত লিখতে বললে সে ভর্তি হয় একটি লেখালেখির কর্মশালায়। সেখানে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময়ই সে শেষ করে তার প্রথম বই 'ট্রেজার অব দ্য লস্ট সি'-এর কাজ।

অনন্য প্রতিভার নাম প্রণীনা

নবারুণের বন্ধুরা, মৌলভীবাজারের ছোট্ট শিশু দেয়ালিকার অনন্য প্রতিভার কথা তো তোমাদের আগেই জানিয়েছিলাম। এবার তোমাদের জানাবো ভারতের ছত্রিশগড় রাজ্যের ছোট্ট মেয়ে প্রণীনার অনন্য প্রতিভার কথা। তার বয়স কত জানো? মাত্র আড়াই বছর।

আড়াই বছরের মেয়ে প্রণীনা অনর্গল বলতে পারে দুই শতাধিক দেশের রাজধানীর নাম। এত কম বয়সে কীভাবে এটা সম্ভব! তার ব্যতিক্রমী এ স্মরণশক্তি নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে পুরো টুইটার জগতে। এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ছোট্ট মেয়েটি বেশিরভাগ দেশের রাজধানীর নাম বলতে পারে, যা একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্যও অনেক সময় কষ্টকর হয়। ছোটো থেকেই তার স্মৃতিশক্তি ভালো। দুই বছর বয়সে সে ২০৫টি দেশের রাজধানীর নাম বলতে পারত।

প্রণীনা ছত্রিশগড় রাজ্যের আইএএস কর্মকর্তা প্রিয়াঙ্কা শুক্লার সহকর্মী প্রদীপ ট্যান্ডনের মেয়ে। প্রিয়াঙ্কা শুক্লাই এই ব্যতিক্রমী স্মরণশক্তির অধিকারী প্রণীনার একটি ভিডিও টুইটারে পোস্ট করে সবার নজরে আনেন। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

রিজওয়ান আল রাহাত, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্বরলিপি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আরিকা আজিজ ফারিন, শিশু শ্রেণি, রয়েল একাডেমি, আরামবাগ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr